ভারত ও ভূমণ্ডল

তৃতীয় পর্যায়

অষ্টম শ্রেণীর জন্য

শ্রীউপেন্দ্র নাথ রায় এম.এ.,বি.টি
ও
৺সুরেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী বি.এস-সি

বিষয় পৃষ্ঠা

Water Transport ... [2 pages]

Air Transport ... [2 pages]

– Air routes linking Calcutta, Delhi, Bombay and Madras).

(l) Distribution of Population : [6 pages]

(i) Factors affecting population distribution in India.

(ii) Distribution of population in India statewise.

(iii) Density of population statewise.

(m) Important Towns and Cities. [10 pages]

(i) Causes of growth of Towns and Cities.

(ii) Cities having population of 10 lakhs and above —their location, population—importance.

(iii) Reference to Cities having population of one lakh and above in different states.

[*In the description of the items (c) to (f), a brief account of the major elements of Physical Geography pertaining to the aforesaid items should be given.*]

সূচীপত্র

Recommended by the W. B. Board of Secondary Education as a Text Book Vide No. T.B. 76/8/G/84 Dated 31. 12. 76.

ভারত ও ভূমণ্ডল

তৃতীয় পর্যায়

অষ্টম শ্রেণীর জন্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, কালীহাতী (ময়মনসিংহ)
উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক ও ২৪ পরগনা
জেলার অন্তর্গত কেওড়াতলা শরৎচন্দ্র মেমোরিয়াল
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন
প্রধান শিক্ষক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় এম্. এ., বি. টি.

ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, মহারাজা
কাশিমবাজার পলিটেক্‌নিক ইন্‌স্টিটিউটের
ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক

৺সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি. এস্-সি.

ইস্টার্ন পাবলিশার্স
৮-সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক নির্ধারিত অষ্টম শ্রেণীর ভূগোলের পাঠ্য-সূচী অনুসারে লিখিত "ভারত ও ভূমণ্ডল" (তৃতীয় পর্যায়) প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত বিষয়গুলির নির্ভুল ও প্রাঞ্জল বর্ণনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বিষয়বস্তু যাহাতে শিক্ষার্থিগণের সহজবোধ্য হয় সেজন্য বহুসংখ্যক চিত্র ও মানচিত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 'ভারত ও ভূমণ্ডল'-এর বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। পুস্তক-খানিকে শিক্ষার্থিগণের সমধিক উপযোগী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। এক্ষণে এই পুস্তকখানি শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের মনঃপূত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুখবোধ্য ও আশানুরূপ ফলপ্রদ হইলে শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৪

বিনীত
গ্রন্থকার

বিষয় পৃষ্ঠা

উত্তরমেরু
গ্রীণল্যাণ্ড
এশিয়া
সুমেরু বৃত্ত
জুনো
ভ্যাঙ্কুবর
উত্তর আমেরিকা
নিউইয়র্ক
ওয়াশিংটন
অ্যাজোর্স দ্বীঃপুঃ
সানফ্রান্সিসকো
নিউঅর্লিন্স
হাওয়াই দ্বীঃপুঃ
কর্কট ক্রান্তি
কেপভার্ড দ্বীঃপুঃ
মার্শাল দ্বীঃপুঃ
মেক্সিকো
কারাকাস
প্রশান্ত মহাসাগর
পানামা
বোগোটা
বেলেম
গিলবার্ট দ্বীঃপুঃ
মার্কুইসাস দ্বীঃপুঃ
লিমা
দক্ষিণ আমেরিকা
ফিজি দ্বীঃপুঃ
মকর ক্রান্তি
নিউ ক্যালিডোনিয়া
সান্টিয়াগো
রিওডি জেনিরো
বুয়েনস আইরেস
নিউজীল্যাণ্ড
ফকল্যাণ্ড দ্বীঃপুঃ
কুমেরু বৃত্ত
দক্ষিণ মহাসাগর
কুমেরু অঞ্চল

ভারত ও ভূমণ্ডল

সূচনা

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন, সভ্য ও উন্নত দেশ। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি এ দেশের সুপ্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থরাজি এবং মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানের ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত কীর্তিচিহ্নসমূহ বিগত সুমহান শিক্ষা-সংস্কৃতির নিদর্শন বহন করে। অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর উদ্গাতা তথাগত বুদ্ধের বাণীর উৎস-ভূমি এই ভারত। সম্রাট অশোক তাঁহার সেই বাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতের সর্বত্র, এমন কি উত্তরে —চীন, তিব্বত, নেপাল, ভুটান ; দক্ষিণে—সিংহল (শ্রীলঙ্কা) ; পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে—ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় পর্যন্ত তাঁহার অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। রাজর্ষি অশোকের আদর্শ ছিল দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে মানব-চিত্ত বিজয়। তাঁহার আনুকূল্যে সমগ্র এশিয়া, এমন কি, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের অন্তর্গত গ্রীস, মিশরাদি দেশেও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসারিত হইয়াছিল। ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি নানাবিষয়ে ভাব-বিনিময়ের ফলে প্রাচীনকাল হইতেই প্রতিবেশী দেশসমূহের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভাবগত যোগাযোগ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথও সুগম হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনের ফলে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান মিশ্র-সভ্যতা ও কৃষ্টি গড়িয়া উঠে। বস্তুত হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশ আমাদের এই ভারত। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজ-নৈতিক গুরুত্ব সমধিক।

মুসলিম যুগের অন্তে ইউরোপ হইতে ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির লোকেরা বাণিজ্য করিতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কালক্রমে ইংরাজদিগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইল এবং তাহারা ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিল।

প্রায় দুইশত বৎসর যাবত এই দেশ ইংরাজদিগের শাসনাধীনে ছিল। ভারতবাসীরা দেশকে স্বাধীন করিবার জন্য বহুবর্ষ ব্যাপী অহিংস সংগ্রাম শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ইংরাজ শাসকেরা

ভারতবর্ষকে দুইটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া এই দেশ হইতে বিদায় লইল। দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটির নাম **ভারত বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র,** অপরটির নাম **পাকিস্তান**। অতঃপর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ভারত **স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্র রাষ্ট্রে** পরিণত হইল। **অশোক চক্র** সরকারী প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন ভারত সম্রাট অশোকের অহিংসা, শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শই গ্রহণ করিল।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ভারতের অবস্থান

পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়ার দক্ষিণাংশের মধ্যভাগে ত্রিভুজাকৃতি উপদ্বীপ **ভারত পূর্ব** গোলার্ধের (এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া) কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং এই উপদ্বীপ ভারত মহাসাগরের দিকে ক্রমশ সরু হইয়া দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর সীমায় তুষারমণ্ডিত হিমালয় পর্বতমালা, উহার উত্তরে চীন; উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান ও সোভিয়েট দেশ; পূর্ব সীমায় ব্রহ্মদেশ; বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগর; পশ্চিম সীমায় পাকিস্তান ও আরবসাগর; দক্ষিণ সীমায় শ্রীলঙ্কা ও ভারত মহাসাগর। পশ্চিমে আরব সাগরের **লাক্ষা দ্বীপ, আমিনদিভি ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ** এবং পূর্বে বঙ্গোপসাগরের **আন্দামান** ও **নিকোবর** দ্বীপপুঞ্জ ভারতের শাসনাধীন। **শ্রীলঙ্কা** ভারত-শাসন বহির্ভূত একটি ক্ষুদ্র দেশ। **মান্নার** উপসাগর ও **পক** প্রণালী শ্রীলঙ্কাকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

ভারতের সমগ্র অংশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণতম প্রান্ত কুমারিকা অন্তরীপ ৮°৪´ উঃ অক্ষাংশ প্রায় স্পর্শ করিয়াছে। ভারতের সর্বোত্তর সীমা ৩৭°৬´ উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত; পশ্চিমে ৬৮°৭´ পূঃ দ্রাঘিমা হইতে পূর্বে ৯৭°২৫´ পূঃ দ্রাঘিমা পর্যন্ত ভারত বিস্তৃত। কর্কটক্রান্তিরেখা (২৩½° উঃ অঃ) ভারতের প্রায় মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে। ৮০° পূঃ দ্রাঘিমা ভারতকে প্রায়

এশিয়া
৬০০
০
৬০০
কি.মি.
মস্কো
ভার্খোলোভস্ক
বল্খাস হ্রদ
আরল সাগর
তাসখন্দ
সিরদরিয়া নং
বাকু
আঙ্কারা
বাগদাদ
তেহরাণ
ইরাণ
বসরা
কুয়েত
আম্মান
সৌদি আরব
রিয়াধ
ট্রাসিয়াল ওমান
মস্কট
ইয়েমেন
দঃ আরবীয় সম্মিলিত রাজ্য
এডেন
আফগানিস্থান
কাবুল
রাওয়ালপিণ্ডি
পাকিস্থান
করাচী
চীন
নেপাল
কাটমাণ্ডু
দিল্লী
ভারত
বোম্বাই
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
মাদ্রাজ
কলম্বো
শ্রীলঙ্কা
মালয়
সারাওয়াক
কালিমান্তান বোর্ণিও
সুলাওয়েসি (সেলিবিস)
আন্দালাস (সুমাত্রা)
জাভা
যবদ্বীপ
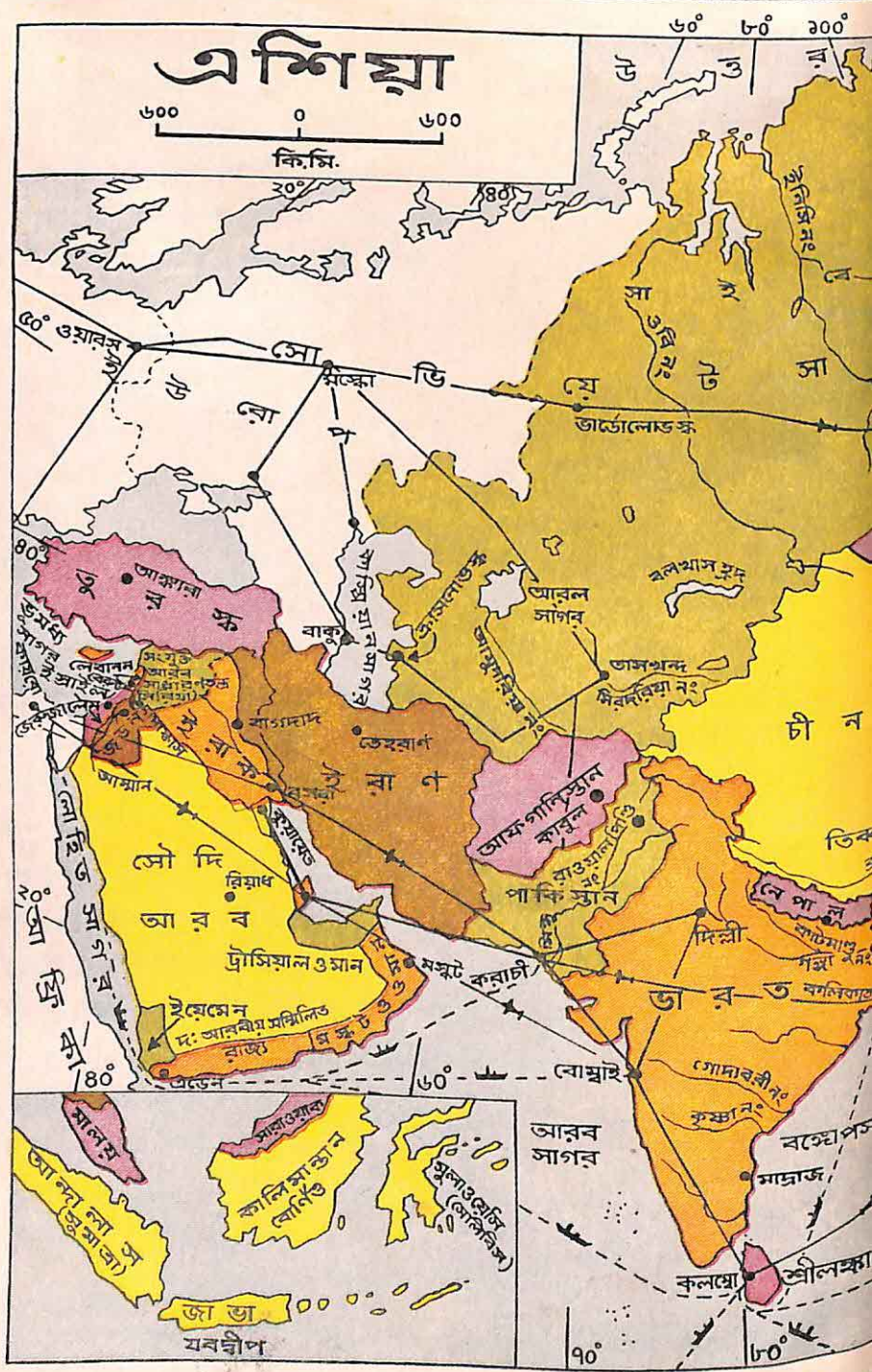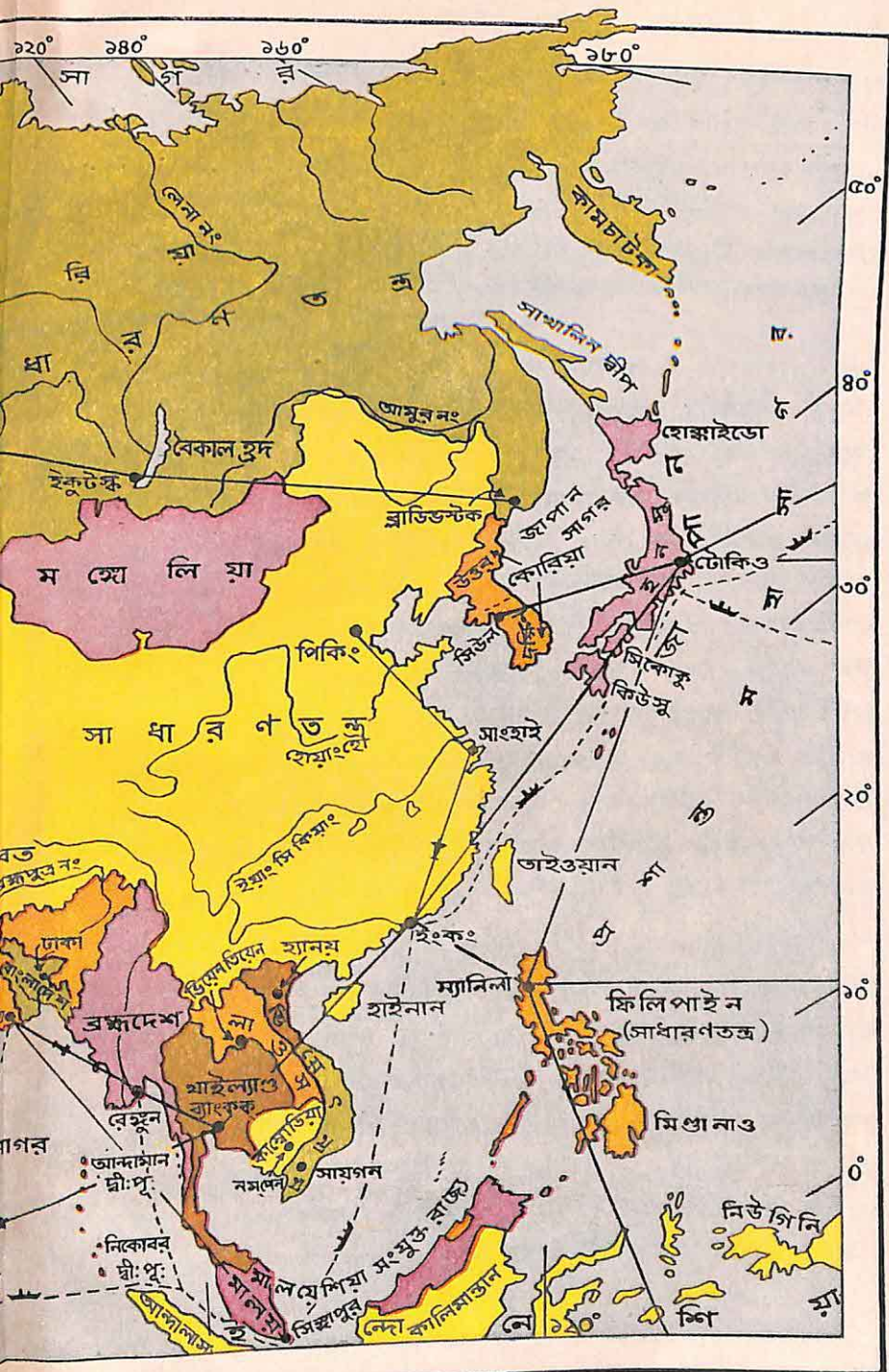
সমদ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। উত্তরে কাশ্মীরের সর্বোত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ৩,২০০ কি-মি. এবং কচ্ছের পশ্চিম সীমা হইতে আসামের পূর্ব সীমা পর্যন্ত ৩,০০০ কি-মি. এই দেশ বিস্তৃত। ভারতের আয়তন প্রায় *৩২,৮০,৪৮৩ বর্গ কি-মি.; আয়তনে ভারত পৃথিবীতে সপ্তম স্থান অধিকার করে। ইউ. এস. এস আর., চীন, কানাডা, ব্রাজিল, ইউ. এস. এ. এবং অস্ট্রেলিয়ার পরে ভারত। ভারতের স্থলভাগের সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য ১৫,২০০ কি-মি. এবং তটরেখার দৈর্ঘ্য ৬,০৮৩ কি-মি.।

অবস্থানের গুরুত্ব ঃ জলবায়ু, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আত্মরক্ষার পক্ষে ভারতের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরে উত্তুঙ্গ **হিমালয়** পর্বতমালা বিশাল প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ভারতকে মধ্য এশিয়ার হিমশীতল বায়ু হইতে রক্ষা করিতেছে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয়ে বাধা প্রাপ্ত হইবার ফলে উত্তর ভারতে বারিবর্ষণ করিয়া দেশকে সমৃদ্ধ করিতে সাহায্য করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, তুষারমণ্ডিত হিমালয় উত্তর দিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতকে কিয়ৎপরিমাণে রক্ষা করিতেছে। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে **পাটকই, নাগা, লুসাই** নামে পর্বতশ্রেণী ভারতকে ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক করিয়াছে। প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারত একটি ভৌগোলিক এককে (Geographical unit) পরিণত হইলেও ভারতের ন্যায় বিশাল, উন্নত ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশের সহিত নেপাল, তিব্বত, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সোভিয়েট এশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের, এমন কি পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহেরও যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

ভারতের অবস্থানের উপর সমুদ্রের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য। ভারত তিনদিকে সমুদ্রের জলরাশি বেষ্টিত উপদ্বীপ। পূর্ব গোলার্ধের **কেন্দ্রস্থলে** অবস্থিত হওয়ায় **সমুদ্রপথে** এশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে ইউরোপের গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, সোভিয়েট প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশসমূহ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড), মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি কাঁচামাল উৎপাদনকারী দেশসমূহের সহিত ভারত বাণিজ্য সূত্রে আবদ্ধ। স্থলপথে ও জলপথে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সহিতও ভারতের বাণিজ্য চলে।

---

* পাকিস্তান ও চীনের বে-আইনী অধিকৃত স্থান সমেত (১৯৭১)।

ইহা ব্যতীত, **বিমানপথে** বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র ভারতের যোগাযোগ আছে। কেন্দ্রস্থলে অবস্থান হেতু **আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের** পক্ষে ভারতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

যদিও দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয় পর্বতমালা স্থলবাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল নহে তথাপি **গিরিপথ** দিয়া ভারতের সহিত তিব্বত, ভুটান, সোভিয়েট এশিয়া, আফগানিস্তান ও ব্রহ্মদেশের স্থলবাণিজ্য চলে। প্রাচীনকালে কাশ্মীরের **কারাকোরাম, বুজিল** প্রভৃতি গিরিপথ দিয়া মধ্য এশিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীনগরের **জোজি লা** গিরিপথ হইতে কারাকোরামের **সাসার** গিরিপথে তুর্কিস্তানের সহিত বাণিজ্য চলিত। দার্জিলিং হইতে **চুম্বি** উপত্যকার উপর দিয়া সান্-পু নদী পার হইয়া তিব্বতের সহিত বাণিজ্য চলিত। পূর্বে স্থলপথে ও জলপথে চীন দেশের সহিতও বাণিজ্য চলিত। বর্তমানে তিব্বত চীনের শাসনাধীন বলিয়া তিব্বতের সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ হইয়াছে।

ভারতের সীমান্তবর্তী রক্সৌল হইতে নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ডু পর্যন্ত ত্রিভুবন রাজপথে নেপালের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলে। পূর্ব সীমান্তে **টুজু, মণিপুর, আন, টৌন্‌গুপ** প্রভৃতি গিরিপথ দিয়া ব্রহ্মদেশের সহিত স্থলবাণিজ্য চলে। কিন্তু অত্যধিক বন্ধুরতার জন্য এই সকল গিরিপথে ট্রেনে বা মোটরে যাতায়াত অসম্ভব। অধিকন্তু শীতকালে গিরিপথগুলি বরফাচ্ছন্ন থাকে বলিয়া স্থলবাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়। বর্ষাকালেও এই সকল গিরিপথ দুর্গম হয়। নানা অসুবিধার জন্য গিরিপথে বাণিজ্য প্রসারলাভ করিতে পারে নাই। তবে সমুদ্রপথে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উত্তরোত্তর প্রাধান্য লাভ করিতেছে। ভারতের চিরাচরিত বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসারে শুধু এশিয়ার অন্তর্গত প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ নহে, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদূরবর্তী মহাদেশের সহিত ভারত সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে।

ভারত পৃথিবীর প্রতিরূপ

বিশাল ও বিচিত্র আমাদের মাতৃভূমি ভারত। বাস্তবিক একটি দেশে এরূপ নানা বৈচিত্র্যের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। ভারতের উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত **হিমালয়** এবং দক্ষিণে সুনীল জলধি **ভারত মহাসাগর।** অরণ্যসঙ্কুল **পার্বতভূমি,** লাভাগঠিত **মালভূমি** ও নদী বিধৌত **সমভূমি** ইহার স্থলভাগের বৈচিত্র্য। কাশ্মীরে অবস্থিত **লাডাক** মালভূমি ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমি। গিরি-সাগর বেষ্টিত এই বিরাট দেশের কোথাও শস্যশ্যামলা উর্বরা ভূমির অপূর্ব শোভা, কোথাও যোজনব্যাপী স্নিগ্ধশ্যামল বনভূমি, আবার কোথাও বা প্রচণ্ড সূর্যকিরণতপ্ত তরুলতাহীন সুদূর বিস্তৃত অত্যুষ্ণ বালুকাময় মরুভূমি। উত্তুঙ্গ পর্বত, দীর্ঘ প্রবাহিনী নদী, বিস্তৃত হ্রদ, উষ্ণ প্রস্রবণ, কলনাদী নির্ঝর প্রভৃতি এই দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। মোটামুটিভাবে ভারত **মৌসুমী** জলবায়ুর দেশ হইলেও এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের **জলবায়ুও** বিচিত্র ; কোথাও প্রচুর বৃষ্টিপাত, কোথাও স্বল্প বৃষ্টিপাত, আবার কোথাও বা বৃষ্টিহীন শুষ্ক অঞ্চল। পার্বত অঞ্চলের অত্যধিক **শীতল** জলবায়ু, মরু অঞ্চলের দারুণ **উষ্ণ** জলবায়ু, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অভ্যন্তর ভাগের **চরম** জলবায়ু এবং সমভূমির নদী-উপত্যকার **নাতিশীতোষ্ণ** জলবায়ু ভারতে দৃষ্ট হয়। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জীর নাতিদূরে মৌসিনরাম নামক গ্রামে পৃথিবীর মধ্যে **সর্বাধিক বৃষ্টিপাত** হয়। আবার রাজস্থানের থর মরু অঞ্চল প্রায় **বৃষ্টিহীন।**

ভারতের **স্বাভাবিক উদ্ভিদের** ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। যেমন, হিমালয় গাত্রের উচ্চাংশে সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি, হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে এবং মেঘালয়, আসাম ও পশ্চিম উপকূলের পার্বত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যভূমি, মালভূমি অঞ্চলের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম অংশে পর্ণমোচী বৃক্ষের মৌসুমী বনভূমি, রাজস্থানের দক্ষিণ পূর্বাংশে গুল্মভূমি এবং পশ্চিমাংশে মরুস্থলীতে বাব্‌লাজাতীয় মরু উদ্ভিদ, বঙ্গোপসাগরের উপকূলের অরণ্যে ম্যানগ্রোভ জাতীয় সুন্দরী বৃক্ষের বনভূমি দৃষ্ট হয়। শাল, **সেগুন,** দেবদারু, পাইন, চন্দন, আবলুস, সুন্দরী প্রভৃতি ভারতের **বনজ** সম্পদ এবং কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র প্রভৃতি **খনিজ** সম্পদ উল্লেখযোগ্য। **অভ্র,**

ইলমেনাইট ও **মোনাজাইট** উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। জলবায়ুর বৈচিত্র্য ও **মৃত্তিকার** উর্বরতার তারতম্যের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার **কৃষিজ** দ্রব্য উৎপন্ন হয়। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, আসাম, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে অধিক **ধানের** চাষ হয়, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর **গমের** চাষ হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলে প্রচুর **তুলা** উৎপন্ন হয়। ভারতের উৎকৃষ্ট **চা, তৈলবীজ** ও **পাট** পৃথিবীর বিশিষ্ট পণ্য। ভারতবাসীর **কুটীরশিল্প** ও **ভাস্কর্য** প্রাচীনকাল হইতেই জগদ্বিখ্যাত। বৃহদায়তন **যন্ত্রশিল্পে** ভারত যেমন ক্রমশঃ সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে তেমনি **আন্তর্জাতিক** বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ভারত প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে।

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ন্যায় এখানকার অধিবাসী ও উহাদের জীবনযাত্রার মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই বিশাল দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন খাদ্য, বিভিন্ন আচার ব্যবহার, বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন জীবনযাত্রা প্রণালী এক অতুলনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। এত বিভিন্নতার মধ্যেও একতা ভারতের জাতীয় জীবনের গৌরবময় বৈশিষ্ট্য। যুগে যুগে পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানাজাতির ও নানা-ধর্মের লোক আসিয়া ভারতের জন-সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। অনার্য, দ্রাবিড় ও আর্য জাতির সংমিশ্রণে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা ও সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় মানুষ এই দেশে যেমন দেখা যায়, আবার ঘোর কৃষ্ণবর্ণ খর্বকায় মানুষেরও অভাব নাই। অনার্যদের বংশধর **কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঙ্গে** প্রভৃতি আদিবাসীদের জীবনধারা আধুনিক জীবন-ধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অধিবাসীদিগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা আলোচনা করিলে বুঝা যায় এই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় দেশ যেন একটি **উপমহাদেশ** (Sub-Continent) এবং **পৃথিবীর ক্ষুদ্র প্রতিরূপ** (Epitome of the World)। পৃথিবীর নানা দেশের লোকজন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যুগে যুগে ভারতে আসিয়াছে এবং এখনও আসিয়া মিলিত হইতেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনতীর্থ আমাদের এই ভারত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ
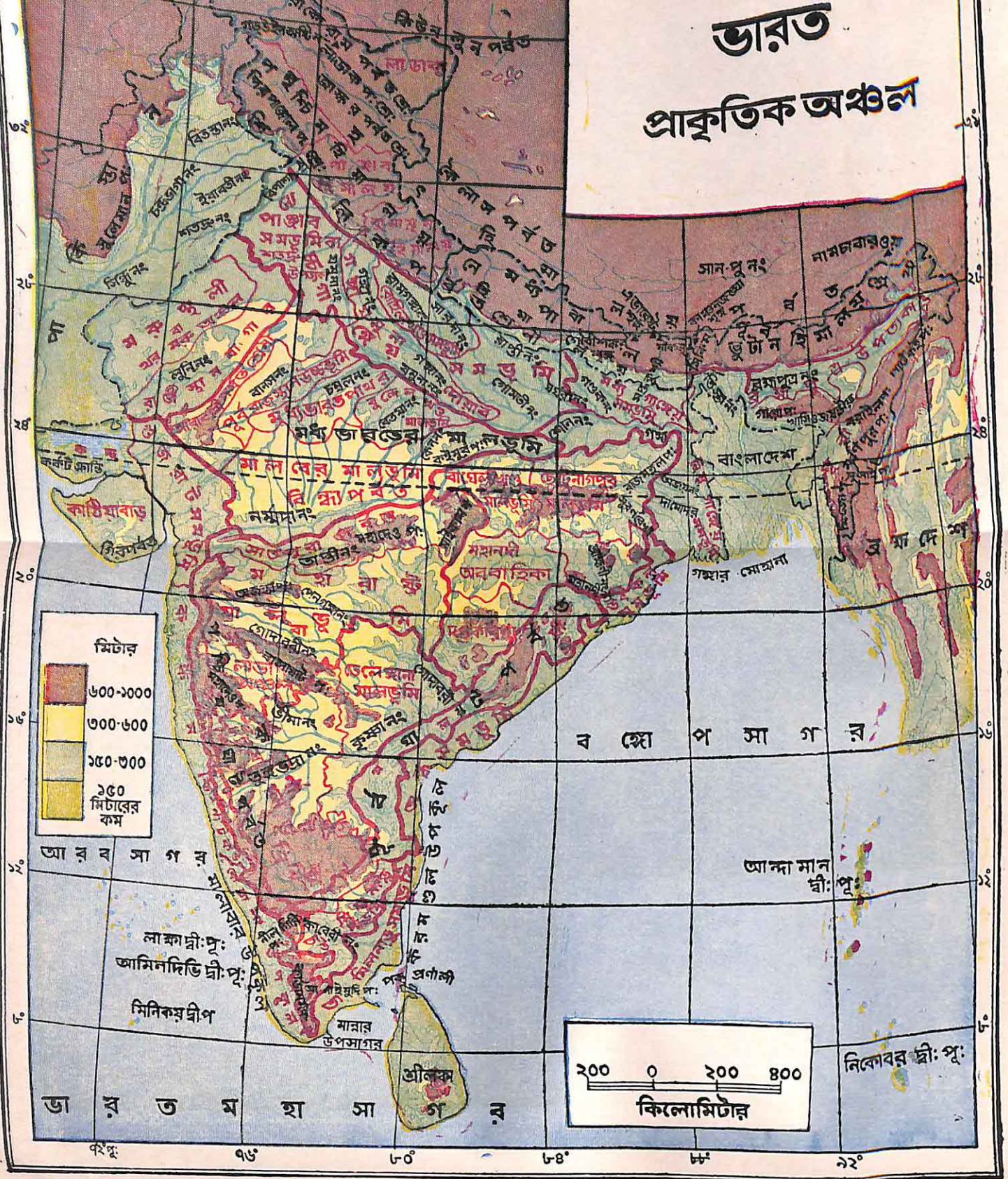
ভারতের প্রাকৃতিক গঠন

বিশাল ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন **ভূ-প্রকৃতি** দেখা যায়। ভূ-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) উত্তর ও উত্তর পূর্বের পার্বতভূমি, (খ) উত্তর ভারতের নদীগঠিত বিস্তৃত সমভূমি, (গ) দক্ষিণ-ভারতের মালভূমি ও (ঘ) উপকূলের নিম্ন সমভূমি।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পার্বতভূমি : ভারতের উত্তরাংশ জুড়িয়া সুউচ্চ **হিমালয়** পর্বতমালা এক বিরাট প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমার আরও কিছু উত্তরে **পামীর** মালভূমি। এই মালভূমি হইতে নানাদিকে পর্বতমালা বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে 'পামীর গ্রন্থি' বলা হয়। পামীর গ্রন্থি হইতে বহির্গত হইয়া হিমালয় ভারতের উত্তর সীমা দিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ও পরে পূর্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিম হইতে আসামের পূর্ব সীমা পর্যন্ত হিমালয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫০০ কি-মি. ; বিস্তার ১৫০ হইতে ৪০০ কি-মি.। হিমালয় পর্বতমালা তিনটি সমান্তরাল পর্বত-শ্রেণী দ্বারা গঠিত; সেগুলির মধ্যে মধ্যে বিস্তীর্ণ ওউচ্চ উপত্যকা আছে। তিনটি শ্রেণীর মধ্যে সর্বদক্ষিণের শ্রেণীটির উচ্চতা কম এবং দৈর্ঘ্যও বেশী নহে। এই নিম্ন পাহাড়শ্রেণীকে (Foot Hills) **অবহিমালয়** বা **শিবালিক** (Sub-Himalayas or the Siwalik Range) বলা হয়। ইহার গড় উচ্চতা ৬০০—১,৫০০ মিটার। মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণী অবস্থান ও উচ্চতা অনুসারে মধ্যম। ইহাকে **মধ্য** বা **অন্তর্হিমালয়** (Middle or Lesser Himalayas) বা **হিমাচল** বলা হয়। ইহার গড় উচ্চতা ১,৮০০—৫,০০০ মিটার। মধ্য হিমালয়ের উত্তরে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণীটি অবস্থিত। ইহা **গ্রেট** বা **প্রধান হিমালয়** (The Great Himalayas) বা **হিমাদ্রি** নামে পরিচিত। ইহার গড় উচ্চতা ৬,০০০ মিটারের অধিক। এই শ্রেণীর চিরতুষারমণ্ডিত উচ্চ শৃঙ্গগুলি নেপালে অবস্থিত। বিরাট তুষারক্ষেত্রকে নেপালী ভাষায় **হিমাল** বলে। হিমের বা তুষারের আলয় হইতে হিমালয় নাম হইয়াছে।

সুদীর্ঘ হিমালয় পর্বতমালাকে প্রধানত তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **পশ্চিম হিমালয় অঞ্চল**, (২) **মধ্য হিমালয় অঞ্চল** ও (৩) **পূর্ব হিমালয় অঞ্চল**। পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যেমন, **কাশ্মীর হিমালয়, পাঞ্জাব হিমালয়** (হিমাচল প্রদেশ হিমালয়) ও **কুমীয়ুন হিমালয়** (উত্তর প্রদেশ হিমালয়)। কাশ্মীরেই হিমালয়ের বিস্তৃততম অংশ আছে। পশ্চিম হইতে পূর্বে ৭০০ কি-মি. এবং
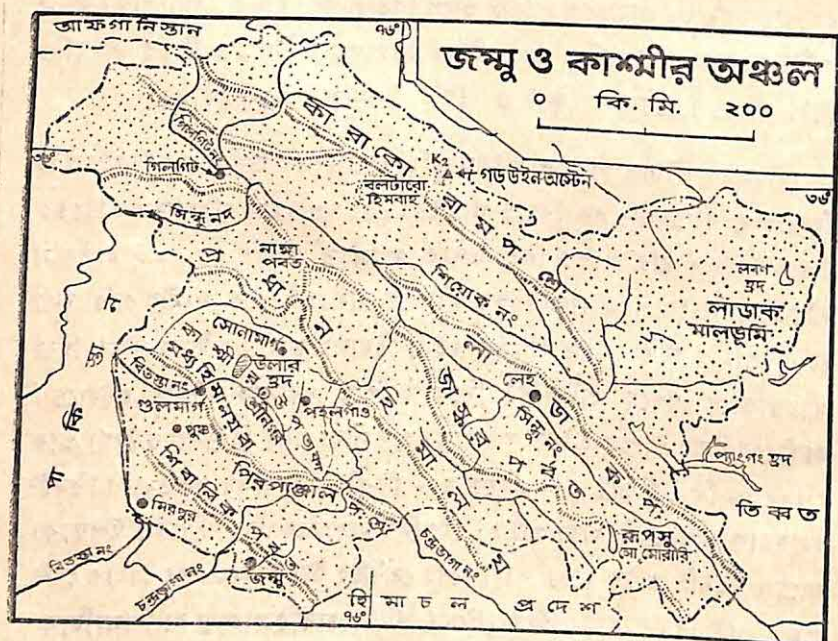
উত্তর হইতে দক্ষিণে ৫০০ কি-মি. ইহা বিস্তৃত এবং ৩,৫০,০০০ বর্গ কি-মি. ইহার আয়তন। **প্রধান হিমালয়** বা **হিমাদ্রি** কাশ্মীরকে উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ কাশ্মীরের জম্মু পাহাড়গুলিই কাশ্মীরের **শিবালিক**। জম্মু শহর শিবালিকের অন্তর্গত একটি পাহাড়ে অবস্থিত। জম্মুর উত্তর-পশ্চিমে **পুঞ্চ** পাহাড় শ্রেণী (৩,০০০ মি.)। জম্মু পাহাড় শ্রেণীর উত্তরে **পিরপাঞ্জাল** (৩,৫০০—৫,০০০ মি.) বা **মধ্য হিমালয়**। ইহা উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত। পিরপাঞ্জালের গিরিপথ সমূহের মধ্যে **পিরপাঞ্জাল** গিরিপথ (৩,৪৯৪ মি.), **বুন্দিল পির** গিরিপথ (৪,২০০ মি.) এবং **বানিহাল** গিরিপথ (২,৮৩২ মি.) উল্লেখযোগ্য। পাঠানকোট

হইতে শ্রীনগরের পথে বানিহাল গিরিপথের 'জহরলাল সুড়ঙ্গের' মধ্য দিয়া সারাবৎসর যাতায়াত করা যায়।

পিরপাঞ্জালের উত্তরে **জাস্কর** ও **প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি)** অবস্থিত। ইহাদের পশ্চিমে প্রধান হিমালয়ের শৃঙ্গ **নাঙ্গা পর্বত** (৮,১২৬ মি.)। নাঙ্গা পর্বত হইতে **প্রধান হিমালয়** (হিমাদ্রি) পূর্বদিকে ৮৫০ কি-মি. পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এবং ইহার গড় উচ্চতা ৫,৫০০ মি.। পিরপাঞ্জাল ও প্রধান হিমালয়ের (হিমাদ্রির) মধ্যে বিখ্যাত **কাশ্মীর** উপত্যকা (The Vale of Kashmir) অবস্থিত। ইহার গড় উচ্চতা ১,৭০০ মি., দক্ষিণ-পূর্ব হইতে উত্তর-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০ কি-মি. এবং বিস্তার ৮০ কি-মি.। বিখ্যাত **উলার হ্রদ** এই উপত্যকায় অবস্থিত। **বিতস্তা** (ঝিলাম) নদীর তীরে এবং উলার হ্রদের নিকটে এই মনোরম উপত্যকার রাজধানী **শ্রীনগর** (১,৮৯৩ মি.) অবস্থিত।

কাশ্মীরের একটি দৃশ্য

কাশ্মীরের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, সুপেয় জলের হ্রদ, তুষারধবল গিরিশৃঙ্গ এবং স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য কাশ্মীরকে **ভূ-স্বর্গ** বলা হয়। উলার, ডাল প্রভৃতি বিখ্যাত হ্রদে শরৎকালে নৌ-ভবনে বাস ও নৌ-ভ্রমণ, নিশাতবাগ, শালিমার প্রভৃতি মনোরম মোগল-উদ্যান, নানাবিধ পুষ্পশোভিত **গুলমার্গ** উপত্যকা প্রভৃতি পর্যটনকারীদের পক্ষে খুবই আকর্ষণের বস্তু। কাশ্মীরের

শ্রীনগরের পূর্বে লিডার উপত্যকায় অবস্থিত **পহলগাঁও** হইতে হিন্দুদের তীর্থ **অমরনাথ** যাওয়া যায়।

সিন্ধুনদ ও শ্যোক নদীর মধ্যবর্তী স্থলে উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে **লাডাক** পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। ইহা ৩৫০ কি-মি. দীর্ঘ এবং ৫০ কি-মি. প্রশস্ত। উত্তর-পূর্ব কাশ্মীরে অবস্থিত **লাডাক** মালভূমি (৪,০০০ মিটারের অধিক উচ্চ) ভারতের সর্বোচ্চ মালভূমি। ইহা তিব্বত মালভূমির অংশ মাত্র। এই মালভূমির মধ্যে মধ্যে পর্বত, উষ্ণ প্রস্রবণ, হ্রদ ও হৈমবাহিক সমভূমি আছে। পর্বত হইতে হিমবাহ গড়াইয়া পড়িবার সময় ইহার প্রবল ঘর্ষণে এবং হিমবাহ বাহিত শিলা, কাঁকর প্রভৃতি সঞ্চয়ের ফলে স্থানে স্থানে এরূপ সমভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ হইতে উত্তরে **লিংঝিতাং, দেপসাঙ্**, **অকসাই চীন, সোডা** প্রভৃতি শুষ্ক ও ঊষর সমভূমি অবস্থিত। লাডাক পর্বতের উত্তরে কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত **কারাকোরাম** পর্বতশ্রেণী। ইহার **গড্উইন অস্টেন** শৃঙ্গ বা K_2 (৮,৬১১ মি.) পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। পশ্চিম কারাকোরামের **বলটোরো** হিমবাহ (৬০ কি-মি. দীর্ঘ) পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ হিমবাহ। কারাকোরামের দক্ষিণ-পূর্ব শাখাকে **কৈলাস** পর্বত বলে। ইহার নিকটে **মানস সরোবর** হ্রদ অবস্থিত। শ্রীনগর হইতে প্রধান হিমালয়ের **জোজি লা** গিরিপথ (৩,৫২৯ মি.) দিয়া লাডাকের রাজধানী **লেহ** শহরে যাওয়া যায়। লেহ শহর হইতে কারাকোরাম পার হইয়া **সাসার** গিরিপথের মধ্য দিয়া চীন তুর্কিস্তানে যাওয়া যায়। **বুর্জিল** গিরিপথ (৪,২০০ মি.) দিয়া শ্রীনগর হইতে গিলগিট হইয়া পামীরে যাওয়া যায়। বুর্জিলের উত্তরে **দেওসাই সমভূমি** (Deosai Plain); এখানে মনুষ্যবসতি কম।

পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলের যে অংশ হিমাচল প্রদেশে ও পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তাহাকে **পাঞ্জাব** বা **হিমাচল প্রদেশ হিমালয়** বলা হয়। পাঞ্জাব হিমালয় অঞ্চলের আয়তন ৪৫,০০০ বর্গ কি-মি.। শিবালিক পাহাড়শ্রেণী পাঞ্জাবের সমভূমি হইতে হিমাচল প্রদেশটিকে পৃথক করিয়াছে। কাশ্মীরের **পিরপাঞ্জাল** হিমাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার উত্তরে চন্দ্রভাগা ও দক্ষিণে ইরাবতী ও বিপাশার উপত্যকা। পিরপাঞ্জালের গড় উচ্চতা ৪,৬০০ মি.। পিরপাঞ্জালের উত্তরে **প্রধান হিমালয়** (৫,০০০—৬,০০০ মি.) উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত হইয়াছে। **ইরাবতীর** দক্ষিণে তুষার

ধবল **ধওলাধর** পর্বত কাংড়া উপত্যকা হইতে প্রায় ৪,৫৫০ মিটার উর্ধ্বে উঠিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার উচ্চ শৃঙ্গ ৫,০০০ মিটারের অধিক। **শতদ্রু** নদী প্রধান হিমালয়কে ভেদ করিয়া গভীর গিরিখাতের সৃষ্টি
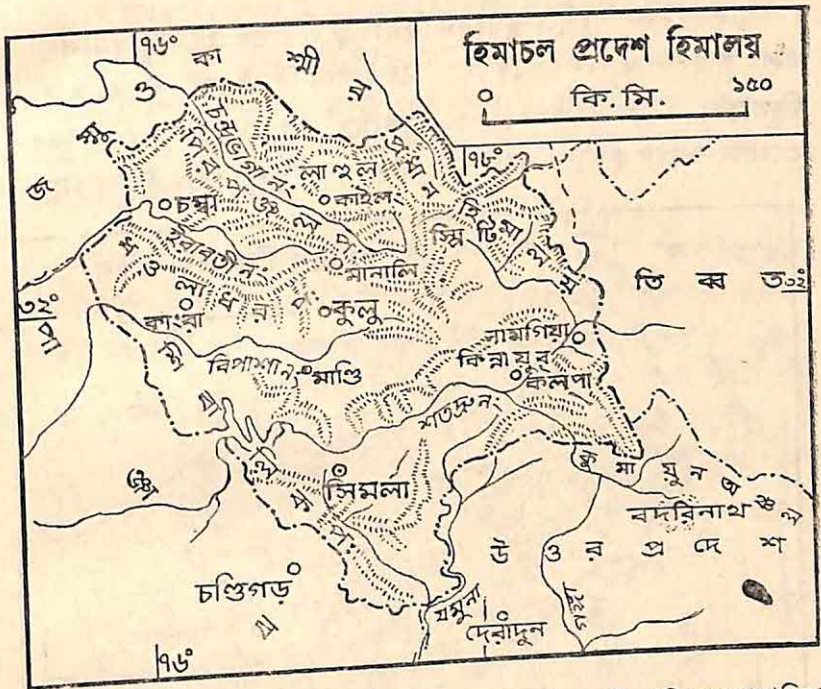
করিয়াছে। তাহার পর ইহা ধওলাধরকে ভেদ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে। **কাংড়া** উপত্যকা হইতে ধওলাধর, **চম্বা** উপত্যকা হইতে পির-পাঞ্জাল, **লাহুল-স্পীটি, কুলু** ও **কল্প** (কিন্নাউর) উপত্যকা হইতে প্রধান হিমালয় ও জাস্কর পর্বতমালা দেখা যায়। এই সকল উপত্যকা স্বাস্থ্যকর ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। কুলু উপত্যকার **মানালি** একটি বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্র। নানারকম ফল এই সকল উপত্যকায় জন্মে। কাংড়া উপত্যকায় চা উৎপন্ন হয়। লাহুলের চন্দ্রা উপত্যকায় লোকবসতি নাই। গ্রীষ্মকালে সেখানে যাযাবর মেষপালকেরা মেষ-চারণ করিতে যায়। কুলু উপত্যকা হইতে মানালি হইয়া **রোটাং** (৩,৯৭৮ মি.) ও **বরলাচা লা** (৪,৮৯১ মি.) গিরিপথ দিয়া সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত লাডাকের রাজধানী লেহ শহরে যাওয়া যায়। হিমাচল প্রদেশের রাজধানী **সিমলা** (২,১৯৫ মি.) হইতে **সিপকি লা** (৩,৫০৫ মি.) গিরিপথে তিব্বতে যাওয়া যায়। কাংড়া ও মাণ্ডি হইতে

সিমলাতে যাতায়াতের জন্য সড়ক আছে। কুলু উপত্যকায় মানালি হইতে **দেওটিব্বা** (৬,০০১ মি.) ও **ইন্দ্রাসন** (৬,২২০ মি.) নামক দুইটি পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়।

পাঞ্জাব হিমালয়ের পূর্বে **কুমায়ুন হিমালয়** বা **উত্তর-প্রদেশ হিমালয়**। ইহার আয়তন ৩৮,০০০ বর্গ কি-মি.। হিমালয়ের তিনটি শ্রেণী—**শিবালিক, হিমাচল** (মধ্য হিমালয়) ও **হিমাদ্রি** (প্রধান হিমালয়) উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত কুমায়ুনে অবস্থিত। **গঙ্গা** ও **যমুনা** নদীর উৎস কুমায়ুন
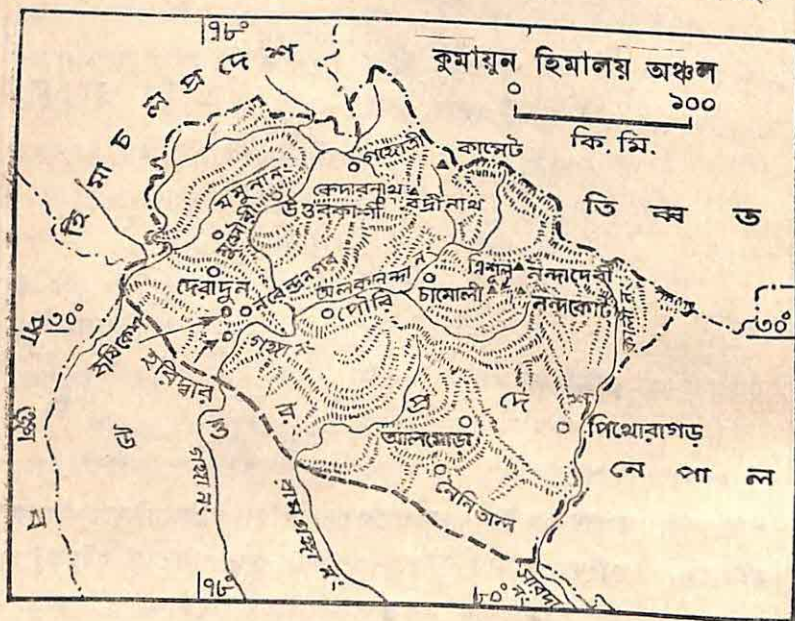
হিমালয়ে। পশ্চিমে যমুনার উপনদী **টোন্‌স্‌** নদী এবং পূর্বে **কালী** নদী কুমায়ুন হিমালয় অঞ্চলকে যথাক্রমে হিমাচল প্রদেশ ও নেপাল হইতে পৃথক করিয়াছে। রামগঙ্গা ও গৌরীগঙ্গা কালী নদীর উপনদী। **শিবালিক** গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে ৭৪ কি-মি. প্রসারিত এবং এখানে ইহার উচ্চতা ৭৫০—১,২০০ মি.। ইহার মধ্যে মধ্যে সুন্দর উপত্যকা আছে। ইহার মধ্যে পশ্চিমে **দুন** (Dun) ও পূর্বে **মারি** (Murree) উপত্যকা বিখ্যাত। দুন ও মারি উপত্যকার উত্তরে মধ্য হিমালয় (হিমাচল)। **মুসৌরী** ও **নাগটিব্বা** পর্বত হিমাচল বা হিমালয়ের অন্তর্গত। মুসৌরী পর্বতে কতকগুলি শৈলাবাস আছে যাহাদের উচ্চতা ২,০০০—২,৬০০ মি.। **নৈনিতাল, আলমোড়া,**

রানীক্ষেত প্রভৃতি শৈলাবাস উল্লেখযোগ্য। কুমায়ুন হিমালয়ে **হিমাদ্রির** সুউচ্চ ও তুষারধবল শৃঙ্গগুলি পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে সারি সারি দণ্ডায়মান। যথা—**নন্দাদেবী** (৭,৮১৭ মি.), **কামেট** (৭,৭৫৬ মি.), **গঙ্গোত্রী** (৬,৬১৪ মি.), **কেদারনাথ** (৬,৯৪০ মি.), **দুনগিরি** (৭,০৬৬ মি.), **বদরীনাথ** (৭,১৩৮ মি.), **ত্রিশূল** (৭,১২০ মি.), **নন্দকোট** (৬,৮৬১ মি.), **নন্দঘুঁটি** (৬,০৬৩ মি.), **শ্রীকণ্ঠ** (৬,৭২৮ মি.) প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত, এই অঞ্চলের **গঙ্গোত্রী** ও **যমুনোত্রী** হিমবাহ উল্লেখযোগ্য।

মধ্যহিমালয় অঞ্চল বলিতে সমগ্র নেপালকে বুঝায়। ইহার আয়তন প্রায় ১,১৬,৮০০ বর্গ কি-মি.। তিনটি নদী দ্বারা নেপাল হিমালয়কে তিন অংশে বিভক্ত করা যায়। পশ্চিমাংশে **কর্ণালী**, মধ্যাংশে **গণ্ডক** এবং পূর্বাংশে **কুশী**

নদী প্রবাহিত হইতেছে। নেপালের পশ্চিমে ঘর্ঘরার অববাহিকা। কর্ণালী ঘর্ঘরার প্রধান উপনদী। নেপালের রাজধানী **কাঠমণ্ডু** মধ্যাংশে অবস্থিত। নেপালের পশ্চিম হইতে পূর্ব পর্যন্ত প্রধান হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—**ধবলগিরি** (৮,১৭২ মি.), **অন্নপূর্ণা** (৮,০৭৮মি.), **মানসলু** (৮,১৫৬ মি.), **গোঁসাইথান** (৮,০১৩ মি.), **মাকালু** (৮,৪৮১ মি.), **মাউন্ট এভারেস্ট** (৮,৮৪৮ মি.) এবং **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (৮,৫৯৮ মি.)। **এভারেস্ট** পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গগুলি চিরতুষারাবৃত। তুষারক্ষেত্র হইতে বহু হিমবাহের সৃষ্টি হইয়াছে। নেপালে মধ্য হিমালয়ের (হিমাচল) নাম **মহাভারত**

লেখ। শিবালিককে এখানে **চুরিয়া** বা **চুরিয়া মুরিয়া** পাহাড়শ্রেণী বলে। এই পাহাড়গুলির দক্ষিণে দীর্ঘতৃণাবৃত বন্ধুর ভূমি **তরাই** নামে পরিচিত।

পূর্ব হিমালয় অঞ্চলকে পশ্চিম ও পূর্ব—এই দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। পশ্চিম অংশে **সিকিম, দার্জিলিং ও ভূটান হিমালয়** এবং পূর্বাংশে
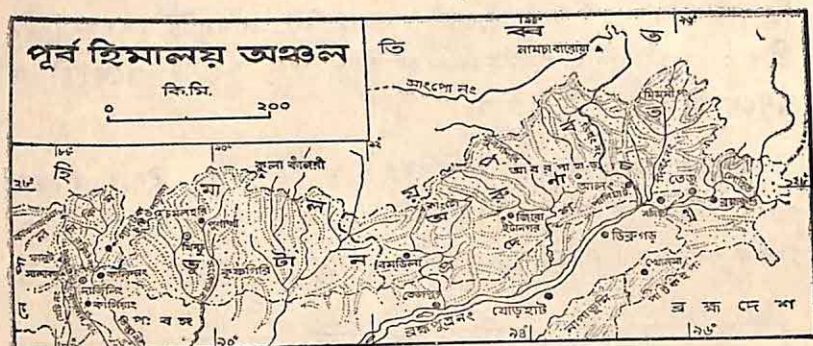
অরুণাচলপ্রদেশ হিমালয়। প্রধান হিমালয় সিকিম হইতে পূর্বদিকে ৪২০ কি-মি. অরুণাচল প্রদেশের **কাঙটো** শৃঙ্গ (৭,০৯০ মি.) পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। সিকিমের দক্ষিণ সীমায় শিবালিককে সরু ঝালরের ন্যায় দেখা যায়। ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইতে হইতে ইহা একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে। সিকিমের পশ্চিম সীমায় **সিংগলীলা** পর্বত এবং পূর্ব সীমায় **ডংখ্যা** পর্বত। সিকিমে হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গের নাম **সিনিওলছু** (৬,৮৯৫ মি.)। **গ্যাংটক** (১,৭৭০ মি.) সিকিমের রাজধানী। এই রাজ্যে **অর্কিড** ফুল গাছের বিচিত্র সমারোহ। **জেলেপ লা** ও **নাথু লা** গিরিপথ দিয়া তিব্বতের **চুম্বি** উপত্যকার সঙ্গে
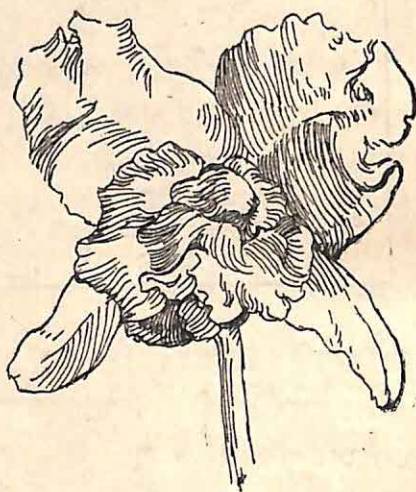
অর্কিড ফুল

সিকিমের যোগাযোগ আছে। সিংগলীলা দার্জিলিংকে নেপাল হইতে পৃথক করিয়াছে। তরাই-এর সমভূমি হইতে দার্জিলিং-এর পার্বতভূমি খাড়াভাবে **সেঞ্চলশৃঙ্গ** (২,৬১৫ মি.) পর্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। ইহার অনতিদূরে

দার্জিলিং শহর (২,১৩৩ মি.)। সিংগলীলার তিনটি শৃঙ্গ আছে। যথা—**সান্দাকফু** (৩,৬৩০ মি.), **সবরগাম** (৩,৫৪৩ মি.) ও **ফালুট** (৩,৫৯৬ মি.)।

দার্জিলিং জেলার মধ্যস্থলে অবস্থিত **টাইগার হিল** (২,৫৬৭ মি.) হইতে তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেস্ট এবং আরও কয়েকটি শৃঙ্গ দেখা যায়। **কাঞ্চনজঙ্ঘা** (৮,৫৯৮ মি.) পূর্ব হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গ। ইহা পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। দার্জিলিং হিমালয়ের পশ্চিম হইতে পূর্বে **মেচি, বালাসন, মহানন্দা, গ্রেট রঙ্গিত** ও **তিস্তা** নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে **তিস্তা** সর্বাপেক্ষা বড় নদী। ইহার গিরিখাত খুব গভীর। এই খাতের পূর্ব দিকে অরণ্যাবৃত জলাভূমি **ডুয়ার্স** অঞ্চল।

ভুটান হিমালয়ের আয়তন ২২,৫০০ বর্গ কি-মি.। ইহার মধ্যে মধ্যে গভীর উপত্যকা আছে। ভুটানের তোর্সা নদীর পূর্বে শিবালিককে পুনরায় দেখা যায়। ভুটানে হিমালয়ের **চোমোলাহ্রি** (৭,৩১৪ মি.), **লিংশি** (৫,৬৫৩ মি.), **কুলকাংড়ি** (৭,৫৫৪ মি.) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ। **লিংসি লা** ও **ইউলে লা** নামক দুইটি গিরিপথ দ্বারা চুম্বি উপত্যকার সহিত যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। **থিম্ফু** ভুটানের রাজধানী।

হিমালয়ের তিনটি শ্রেণী **অরুণাচল প্রদেশে** ৬৭,৫০০ বর্গ কি-মি. স্থান ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে মধ্য হিমালয় ও শিবালিক পাহাড় গভীর অরণ্যাবৃত। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে শিবালিক ৮০০ মি. উচ্চে উত্থিত হইয়াছে। অরুণাচল প্রদেশে প্রধান হিমালয় (হিমাদ্রি) উত্তর-পূর্বদিকে প্রসারিত হইয়া তিব্বতের **নামচাবারওয়া** শৃঙ্গ (৭,৭৫৬ মি.) পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। অরুণাচলপ্রদেশে কতকগুলি বন্ধুর উপত্যকা ও গিরিপথ আছে। যেমন—ঠগ লা (লা=গিরিপথ), তুলুং লা, ডোম লা, অন্দ্র লা, কায়া লা ইত্যাদি। এই সকল গিরিপথ দিয়া তিব্বতে যাওয়া যায়। **বমডি লা** গিরিপথ দিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় যাতায়াত করা যায়। অরুণাচল প্রদেশের **ডিহং** ডিবং ও লোহিতের সহিত মিলিত হইয়া সদিয়া হইতে **ব্রহ্মপুত্র** নামে আসামের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত হইতে একটি পর্বতশ্রেণী **পাটকই, নাগা** ও **লুসাই** নামে এবং আরও দক্ষিণে আরাকান য়োমা ও পেগু য়োমা নামে ব্রহ্মদেশের দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পাটকই পর্বতশ্রেণী ভারত ও ব্রহ্মদেশের

সীমারূপে অবস্থিত। নাগাপাহাড় উত্তর-পূর্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছে। উত্তর কাছাড়ের **বরাইল** পাহাড় ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। বরাইল হইতে পশ্চিমদিকে মেঘালয়ের **জয়ন্তিয়া, খাসি** ও **গারো** পাহাড় বহির্গত হইয়াছে। পূর্ব সীমান্তে **টুজু, মণিপুর, আন, টোনগুপ**—এই সকল গিরিপথ দিয়া ব্রহ্মদেশে যাতায়াত করা চলে। **পূর্বাচল** বলিতে শুধু ভারতের উত্তর-পূর্বদিকের উচ্চ পর্বতমালা বুঝায় না; মণিপুরের পার্বত ও সমভূমি, ত্রিপুরার পাহাড়, মিজোরামের পাহাড় এবং কাছাড় সমতল ভূমিও ইহার অন্তর্গত। **মেঘালয়** মালভূমিকে শিলং বা আসাম মালভূমি বলা হয়। আসাম উপত্যকা ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা।

উত্তর ভারতের নদীগঠিত বিশাল সমভূমি

উত্তরে হিমালয়ের পার্বত অঞ্চল, দক্ষিণে মধ্যভারতের মালভূমি, পশ্চিমে পাকিস্তান এবং পূর্বে আসামের পর্বতশ্রেণী দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূভাগ উত্তর ভারতের বিশাল সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৭২০ কি-মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার প্রায় ২৪০—৩২০ কি-মি.। শতদ্রু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র বাহিত পলিমাটি দ্বারা এই বিরাট সমভূমি গঠিত হইয়াছে। এই মৃত্তিকার স্তর স্থানে স্থানে এতই গভীর যে ৩০৫ মিটার খনন করিয়াও কঠিন শিলাস্তর পাওয়া যায় নাই। পর্বতের পাদদেশের সমভূমিতে (Piedmont plain) কিছু কিছু নদীবাহিত প্রস্তরখণ্ড, নুড়ি, বালি, পলি ইত্যাদি দেখা যায়। পাঞ্জাবে এই ধরণের সমভূমিকে **ভাবর** (Bhabar) বলে। হিমাচল হিমালয় ও শিবালিক হইতে নির্গত হইয়া অনেক সময় ছোট ছোট নদী বা জলধারা এই সকল প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে। ভাবরের আরও কিছু দক্ষিণে আবার এই নদীগুলিকে দেখা যায়। ফলে ভাবরের দক্ষিণে **তরাই** অঞ্চলে জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। সমভূমির প্রাচীন পলিমাটিকে **ভাঙ্গর** (Bhangar) এবং নবীন পলিমাটিকে উত্তরপ্রদেশে **খাদার** বলা হয়। নদীর নিকটবর্তী প্লাবন সমভূমি 'খাদার' পলিমাটি দ্বারা গঠিত।

শতদ্রু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তৃত সমভূমিকে মোটামুটি ৫ ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) পাঞ্জাবের সমভূমি, (২) উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি, (৩) মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমি, (৪) নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি ও (৫) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা। এই বিরাট সমভূমির আয়তন ৬,৫২,০০০ বর্গ কি-মি.। রাজস্থানের শুষ্ক

পশ্চিমাঞ্চল উত্তর ভারতের সমভূমির ⅓ অংশ। এই সমভূমির পশ্চিমাংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু হইয়া আরব সাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার পূর্বাংশ ক্রমশ পূর্বদিকে ঢালু হইয়া বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছে; মধ্যে আছে **আরাবল্লী** পর্বত; আবু পাহাড়ের **গুরুশিখর** (১,৭২২ মি.) ইহার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। আরাবল্লীর উত্তর-পূর্বে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত অনুচ্চ **শৈলশিরা** (Ridge) এই সমভূমির জল বিভাজিকা। এই সমভূমির পশ্চিমাংশে **পাঞ্জাবের সমভূমি**। শতদ্রু পাঞ্জাবের লুধিয়ানা ও জলন্ধর জেলার মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে ২০০ কি-মি. প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহিতেছে। আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিমদিকে **রাজস্থান বাগার** (মরুপ্রায় স্তেপভূমি) এবং বাগারের পশ্চিমে বালুকাময় **মরুস্থলীর** শুষ্ক সমভূমি অঞ্চল (Western Arid Plain)। **লুনি** (Salt River) নদী বাগারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কচ্ছ উপসাগরে পড়িয়াছে।

উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমিকে চারিটি অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা—উচ্চ ও নিম্ন গঙ্গা-যমুনা দোয়াব, রোহিলখণ্ড সমভূমি ও অযোধ্যা সমভূমি। উত্তর প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমা হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত উচ্চ গাঙ্গেয় সমভূমি। এলাহাবাদ হইতে পূর্বে সমগ্র বিহার **মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমির** অন্তর্গত। মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমিকে আবার কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা, সরযূপার সমভূমি, গঙ্গা-ঘর্ঘরা দোয়াব, গঙ্গা-শোণ দোয়াব, মিথিলা, কুশী, মগধ ও অঙ্গ সমভূমি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ (পার্বত অংশ ব্যতীত) লইয়া **নিম্নগাঙ্গেয়সমভূমি** গঠিত। **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার** উত্তরে হিমালয় পর্বতশ্রেণী এবং দক্ষিণদিকে মেঘালয়। ব্রহ্মপুত্র নদ এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। উত্তর ভারতের এই সমভূমি দুইদিকে ক্রমশ উচ্চ হইয়া উত্তরে হিমালয়ের সহিত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের সহিত মিশিয়াছে। আসাম প্রান্তে এই সমভূমি পূর্বদিকে ক্রমশ উচ্চ হইয়া ব্রহ্মদেশীয় পর্বতমালার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের মালভূমি

উত্তর ভারতের সমভূমির দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত যে ভূভাগ তাহা একটি বিরাট মালভূমি। **সাতপুরা, মহাদেব ও মহাকাল** পর্বত দক্ষিণ ভারতের মালভূমিকে উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে। যথা—(১) উত্তরের অপ্রশস্ত **মধ্যভারতের মালভূমি** এবং (২) দক্ষিণের

ত্রিভুজাকৃতি **দক্ষিণাপথ মালভূমি**। মধ্যভারতের মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে **আরাবল্লী** পর্বত, দক্ষিণে **বিন্ধ্য পর্বত** এবং ইহার উত্তর-পূর্বে **ভানরার** পর্বত ও **কৈমুর** পর্বত। এই মালভূমির পশ্চিম অংশে আরাবল্লীর পূর্বে **রাজস্থানের উচ্চভূমি** (২৫০—৫০০ মি.) (East Rajasthan Upland); ইহার পূর্বে **মধ্যভারত পাথর**। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে **মালব** মালভূমি। **বুন্দেলখণ্ড** মালভূমি ইহার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। বুন্দেলখণ্ড ও শোণ নদীর মধ্যবর্তী অংশে **রেওয়ার** মালভূমি। ইহা দক্ষিণে কৈমুর পর্বতের সঙ্গে মিশিয়াছে। কৈমুর পর্বতের দক্ষিণে **বাঘেলখণ্ড** মালভূমি। ইহার পূর্বে **ছোটনাগপুর** মালভূমি ও **পরেশনাথ** পাহাড়। **রাজমহল পাহাড়কে** মধ্যভারত মালভূমির পূর্ব সীমা ধরা হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা আরও উত্তর পূর্বে **শিলং** মালভূমি বা **মেঘালয়** পর্যন্ত বিস্তৃত। রাজমহল পাহাড় ও মেঘালয় মালভূমির মধ্যবর্তী অংশ (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরভাগ) দীর্ঘকাল ধরিয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রনদ-বাহিত পলিমাটি দ্বারা আবৃত হওয়ায় মধ্যভারতের মালভূমি হইতে মেঘালয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

দক্ষিণাপথ মালভূমির আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায়। লাভা সঞ্জাত 'কৃষ্ণ মৃত্তিকা' এই মালভূমির বৈশিষ্ট্য। ইহা দক্ষিণে ক্রমশ অপ্রশস্ত হইতে হইতে অন্তরীপে পরিণত হইয়াছে; ইহা গড়ে ৬০৯ মি. উচ্চ এবং পূর্বদিকে ঢালু। দক্ষিণ ও পশ্চিমে এই মালভূমি ক্রমশ ১,০০০ মিটারের অধিক উচ্চ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উত্তরে ৫০০ মিটারের অধিক উচ্চ নহে। এই মালভূমির উত্তরে **সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল** পর্বত। সাতপুরার শৃঙ্গের নাম **ধূপগড়** (১,৩৫০ মি.)। সাতপুরার দক্ষিণে **অজন্তা** পাহাড়। **পাঁচমারি** (১,০৫০ মি.) মহাদেবের এবং **অমরকণ্টক** (১,০৫৭ মি.) মহাকালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এই মালভূমির পশ্চিমে **পশ্চিমঘাট** বা **সহ্যাদ্রি** পর্বত এবং পূর্বে **পূর্বঘাট** বা **মলয়াদ্রি** পর্বত। পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট দক্ষিণে **নীলগিরি** পর্বতে আসিয়া মিশিয়াছে। এখানে **বাবুলমালা** (২,৩৩৯ মি.) সহ্যাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গ। নীলগিরির দক্ষিণে পর পর **আন্নামালাই, পালনি** ও **কার্ডামম্** পর্বত অবস্থিত। আন্নামালাই পর্বতের **আনাইমুদি** (২,৬৯৫ মি.) দক্ষিণাপথের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

পশ্চিমঘাট পর্বতের গড় উচ্চতা ৯১৫—১,২২০ মি.। কোন কোন স্থানে ইহা প্রায় ২,৪৪০ মি. পর্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্বত উপকূলের দিকে

খুব খাড়া হইলেও পূর্বদিকে ক্রমশ ধীরে ধীরে নামিয়া তরঙ্গায়িত মালভূমিতে মিশিয়াছে। এই পর্বতের উত্তরাংশ ৬৪০ কি-মি. পর্যন্ত লাভা দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহার চূড়াগুলি চ্যাপ্টা এবং ইহারা সিঁড়ির ন্যায় ধাপে ধাপে নামিয়া গিয়াছে। মালভূমির এই অংশটিকে **ডেকান ট্রাপ** [Trap=Stair (সিঁড়ি)] বলে। পূর্বদিক হইতে পশ্চিমঘাট পর্বতকে দেখিলে মনে হয় যেন উহা ধাপে ধাপে উপরে উঠিয়াছে; আবার, পশ্চিম দিকের উপকূলের সমভূমি হইতে দেখিলে মনে হয় যেন উহা খাড়াভাবে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। পশ্চিমঘাট পর্বতের **মহাবালেশ্বর** (১,৪৩৮ মি.), **হরিশচন্দ্রগড়** (১,৪২৪ মি.), **কলসুবাই** (১,৬৪৬ মি.) প্রভৃতি শৃঙ্গ উল্লেখযোগ্য। নীলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ **ডোডাবেতা** (২,৬৩৭ মি.); **মাকুর্তি** (২,৫৫৪ মি.) অন্যতম উচ্চ শৃঙ্গ। পশ্চিমঘাট পর্বতে কয়েকটি গিরিপথ আছে, সেগুলিকে গ্যাপ (Gap) বা ফাঁক বলে। সেগুলির মধ্যদিয়া রেলপথ গিয়াছে। নাসিকের নিকট **থলঘাট,** এবং পুণার নিকট **ভোরঘাট** নামে দুইটি প্রশস্ত গিরিপথ আছে। নীলগিরির দক্ষিণে **পালঘাট** নামক গিরিপথ অবস্থিত।

পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন মালভূমির সমষ্টি মাত্র। নদীর প্রশস্ত উপত্যকা দ্বারা ইহারা স্থানে স্থানে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর গড় উচ্চতা ৪৫০—৬০৯ মি. বলিয়া এই পর্বতশ্রেণী পূর্বের পাহাড় (Eastern Hills) নামেও পরিচিত। পূর্বঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম **মহেন্দ্রগিরি** (১,৫২৩ মি.); ইহার নিকটে উপকূল অতি সঙ্কীর্ণ। পূর্বঘাটের বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলির মধ্যে অন্ধ্রের **নাল্লামালা** (৯০০—১,১০০ মি.), **পালকোণ্ডা,** তামিলনাড়ুর **সিভরয়, জাভাদি, পচামালাই** প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই পাহাড়গুলির মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে এবং মধ্যবর্তী নিম্ন উপত্যকা দিয়া পেন্নার, পালার, ছেয়ার, পন্নাইয়ার, প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। মহানদীর অববাহিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে **ছত্রিশগড়** বলা হয়। ইহার দক্ষিণে **দণ্ডকারণ্য**; বাস্তারের দক্ষিণাংশ, উড়িষ্যার কালাহাণ্ডি ও কোরাপুট জেলা লইয়া ইহা গঠিত। উড়িষ্যার **গড়জাট পাহাড়** ছোটনাগপুর মালভূমির দক্ষিণ হইতে বিস্তৃত।

উপকূলের নিম্নসমভূমি ঃ ভারতের উপকূলভাগকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—**পশ্চিম** ও **পূর্ব উপকূল**। পশ্চিম উপকূলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, (১) **কঙ্কন** উপকূল, (২) **কর্ণাটক** উপকূল

ও (৩) **মালাবার** উপকূল। পূর্ব উপকূলকেও দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(১) **করমণ্ডল** উপকূল এবং (২) **উত্তর সারকার্স** (Circars) (উৎকল উপকূল ও অন্ধ্র উপকূল)। পশ্চিম উপকূলে কাম্বে ও অগভীর কচ্ছ উপসাগর এবং কচ্ছ ও কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপ উপস্থিত। গুজরাটের উপকূলের সমতলভূমি পশ্চিম উপকূলের প্রশস্ততম সমভূমি। সুরাট হইতে গোয়া পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম উপকূলের নাম কঙ্কন এবং গোয়া হইতে মাঙ্গালোর পর্যন্ত অংশের নাম কর্ণাটক এবং ইহার পর কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত মালাবার উপকূল। **কঙ্কন** উপকূলের সঙ্কীর্ণ নিম্নভূমির মধ্যে মধ্যে কিছুটা ভগ্ন। উপকূলের নিকটে সলসেট ও **বোম্বাই** দ্বীপ অবস্থিত। বোম্বাই ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়।

কর্ণাটক উপকূলে প্রস্তর ও বালুকাস্তূপ দেখা যায়। এই উপকূল কোথাও ২৪ কি-মি.-এর অধিক প্রশস্ত নহে, কোন কোন স্থানের বিস্তার মাত্র ৮ কি-মি.। **মালাবার** উপকূলে সমুদ্রতীরে বালিয়াড়ি বা বালির পাহাড় বেশী দেখা যায়। বালির পাহাড়গুলির মধ্যে মধ্যে জলাভূমিকে উপহ্রদ (Lagoons) বা ব্যাক্ ওয়াটার্স (Back waters) বলা হয়। এই উপকূলে **কেরালার** প্রশস্ত সমভূমি অবস্থিত।

কন্যা কুমারিকা হইতে পূর্ব উপকূলে কৃষ্ণা নদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশ **করমণ্ডল** উপকূল। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর সীমায় **পুলিকট** এবং উড়িষ্যায় **চিল্কা** লবণাক্ত উপহ্রদ। গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপের মধ্যে **কোল্লেরু** হ্রদ অবস্থিত। কৃষ্ণা নদীর মোহানা হইতে মহানদীর মোহানা পর্যন্ত সমুদ্র উপকূল বালুকাময় ও সংকীর্ণ। সমগ্র পূর্ব উপকূলে কয়েকটি নদীর **ব-দ্বীপ** আছে। যথা—উড়িষ্যা উপকূলে মহানদীর ব-দ্বীপ, অন্ধ্র উপকূলে গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপ এবং তামিলনাড়ুর উপকূলে আছে কাবেরী নদীর ব-দ্বীপ। পশ্চিম উপকূল সংকীর্ণ; ইহার বিস্তার ৫০—৮০ কি-মি. আবার কোথাও মাত্র ৫—৬ কি-মি., ইহা সুরাট হইতে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত প্রায় ১,৪০০ কি-মি. দীর্ঘ কিন্তু সেই তুলনায় পূর্ব উপকূল অনেকটা প্রশস্ত (গড়ে ৮০—১৫০ কি-মি.) এবং কন্যা কুমারিকা হইতে পুরী পর্যন্ত ১,৫০০ কি-মি. দীর্ঘ। পূর্ব উপকূলের উত্তরাংশ অপেক্ষা দক্ষিণাংশ অধিকতর প্রশস্ত। এই দিকে উপকূল খুব ঢালু, সমুদ্র অগভীর। উত্তরাংশে চিল্কা হ্রদের দক্ষিণে উপকূলের সমভূমিতে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায়। রুশিকুল্য নদী পাহাড়গুলির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

দ্বিতীয় পাঠ

ভারতের নদ-নদী

উত্তর ভারতের নদ-নদীঃ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু এই তিনটি প্রধান নদ-নদী উত্তর ভারতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

গঙ্গানদী (দৈর্ঘ্য ২, ৪০০ কি-মি.) কুমায়ুন হিমালয়ের **গঙ্গোত্রী** হিমবাহের **গোমুখ** নামক বরফের গুহা হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে ৩৫ কি-মি. পশ্চিমে পরে দক্ষিণে আরও ১৪০ কি-মি. হিমালয়ের পার্বত পথে গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়া
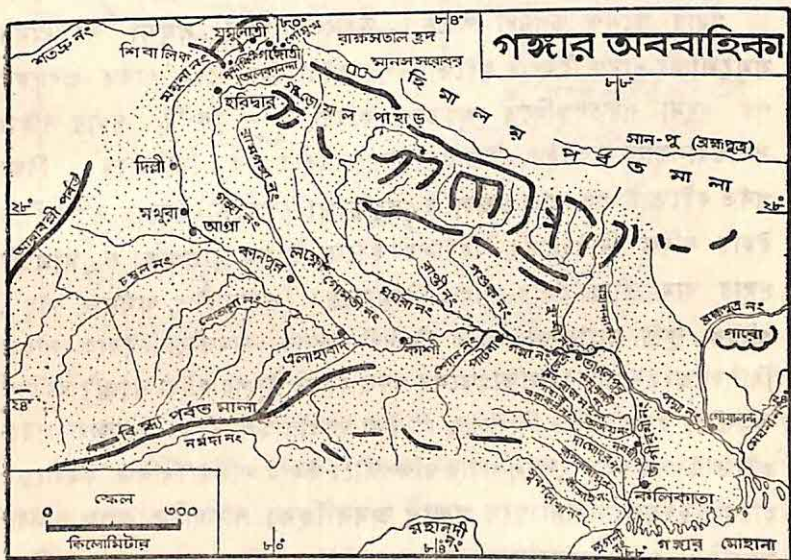
প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে গঙ্গার শীর্ষ নদীর নাম **ভাগীরথী**। অলকাপুরী হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া **অলকানন্দা** নামে উপনদী বামদিক হইতে আসিয়া দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। গৌরীকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া **মন্দাকিনী** রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী-গুলির মিলিত প্রবাহ **গঙ্গা** নামে আরও ৭০ কি-মি. দক্ষিণে বহিয়া নাগটিব্বা ও শিবালিক পর্বতের মধ্যে খাতের সৃষ্টি করিয়া হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে নামিয়াছে। উচ্চ গতিতে বা পার্বত প্রবাহে গঙ্গা খরস্রোতা এবং নৌবাহনযোগ্য

নহে। কিন্তু ইহার পার্বত প্রবাহ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পক্ষে সুবিধাজনক। মধ্যগতিতে গঙ্গা হরিদ্বার হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ববাহিনী হইয়া উত্তর প্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া রাজমহল পাহাড়ের নিকট পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট গঙ্গা দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। মূল স্রোত **পদ্মা** নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং অপর স্রোতটি **ভাগীরথী** নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে উৎপন্ন নদ-নদী **দামোদর, অজয়, রূপনারায়ণ** ও **কাঁসাই** ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। ভাগীরথীর দক্ষিণাংশের নাম **হুগলী**। নিম্নপ্রবাহে গঙ্গার স্রোতের বেগ কম। ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া পলি সঞ্চয় করিয়া নূতন ভূভাগ বা **ব-দ্বীপ** গঠন করিয়াছে।

গঙ্গার অনেক উপনদী আছে। উহাদের মধ্যে **যমুনা** সর্বপ্রধান। **যমুনোত্রী** নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া হিমালয়ের পার্বত প্রবাহের পর যমুনা সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়া ৮০০ কি-মি. গঙ্গার সহিত সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হইয়া এলাহাবাদে উহার সহিত মিশিয়াছে। বিন্ধ্য পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া **চম্বল** ও **বেতোয়া** (বেত্রবতী) যমুনার দক্ষিণতীরে ইহার সহিত মিশিয়াছে। হিমালয় হইতে উৎপন্ন **রামগঙ্গা** ও **গোমতী** গঙ্গার বাম তীরে ইহার সহিত মিলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, **ঘর্ঘরা** (সরযূ), **গণ্ডক, কুশী, মহানন্দা** প্রভৃতি উপনদী গঙ্গার বামতীরে ইহার সহিত মিশিয়াছে। নেপালের মহাভারতলেখ পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া **রাপ্তী** ঘর্ঘরার বামতীরে ইহার সহিত মিশিয়াছে। ইহা ঘর্ঘরার উপনদী। মহাকাল পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া **শোণ** গঙ্গার দক্ষিণতীরে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে মোহানা পর্যন্ত **গঙ্গার অববাহিকা** পলিগঠিত, প্রশস্ত ও উর্বর সমভূমি। গঙ্গার অববাহিকা ভারতের উর্বরতম অঞ্চল এবং **গঙ্গার ব-দ্বীপ** পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। মোহানা হইতে বহুদূর পর্যন্ত (প্রায় ১,৬০০ কি-মি.) গঙ্গা নৌবাহনযোগ্য। গঙ্গার তীরে **হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর নবদ্বীপ, কলিকাতা** প্রভৃতি বহু সমৃদ্ধ নগর আছে। **দিল্লী, মথুরা, আগ্রা** যমুনাতীরে এবং **লক্ষ্ণৌ** গোমতীতীরে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে সর্বদিক বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হয়—**গঙ্গা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদী**।*

*Prof. Meiklejohn's New Geography. p. 254

ব্রহ্মপুত্র নদ (দৈর্ঘ্য ২,৭২০ কি.-মি.) তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ১,২৮০ কি-মি. পর্যন্ত তিব্বত মালভূমির দক্ষিণ এবং হিমালয়ের উত্তর দিয়া **'সান-পু'** Tsang-Po) নামে পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তারপর ইহা **নামচাবারওয়া** শৃঙ্গের নিকটে খুব গভীর ডিহং গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়া অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট নামক স্থানে সমভূমিতে
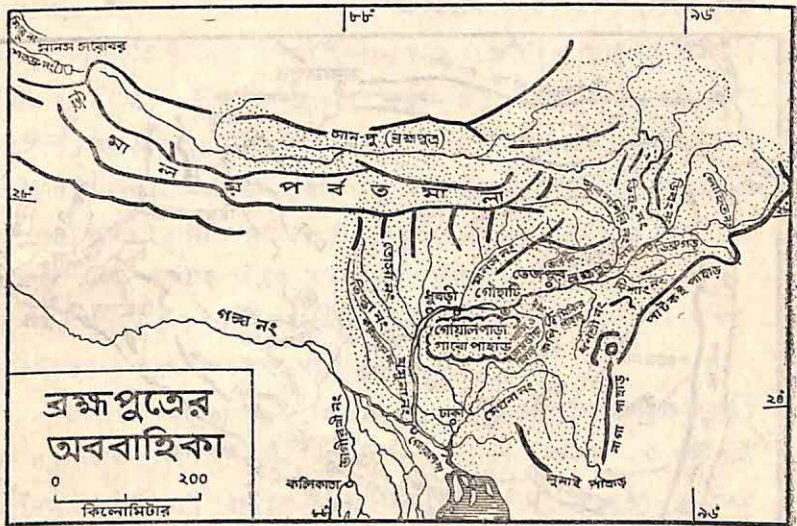
প্রবেশ করিয়াছে। অরুণাচল প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের নাম **ডিহং** এবং এই পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের উচ্চগতি। উচ্চগতিতে এই নদ স্থানে স্থানে বহু জলপ্রপাত ও গিরিখাতের সৃষ্টি করিয়াছে। **ডিহং, ডিবং** ও **লোহিতের** মিলিত প্রবাহ আসামের সদিয়া হইতে **ব্রহ্মপুত্র** নামে আসামের মধ্যভাগ দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। ধুবড়ীর নিকটে দক্ষিণে বাঁকিয়া ইহা বাংলাদেশের মধ্য দিয়া **যমুনা** নামে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। সমুদ্র হইতে ১,২৮০ কি-মি. পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নৌবাহনযোগ্য। **ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী** প্রভৃতি শহর ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। **সুবনশিরি, ভরেলী, তোর্সা, তিস্তা, মানস, সঙ্কোশ** ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরের এবং **ডিবং, লোহিত, কুলশী, ধনশিরি, দিশাং, কপিলি** প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের বামতীরের উপনদী।

সিন্ধুনদ (২,৮৮০ কি-মি.) তিব্বতে মানস সরোবরের নিকট উৎপন্ন হইয়া উত্তর-পশ্চিমে তিব্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছে। তারপর ইহা নাঙ্গা পর্বত ঘুরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে পাকিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। **শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, বিতস্তা** প্রভৃতি সিন্ধুর উপনদী কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বিতস্তার তীরে **শ্রীনগর** ও সিন্ধু নদের তীরে **লেহ** শহর অবস্থিত।

দক্ষিণ ভারতের নদ-নদী : দক্ষিণ ভারতের প্রধান নদীগুলির উৎস পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। দক্ষিণ ভারতের উল্লেখযোগ্য নদী সমূহের মধ্যে

নর্মদা ও তাপ্তী পশ্চিমবাহিনী এবং অবশিষ্ট নদীগুলি পূর্ববাহিনী। নর্মদা ও তাপ্তী নদীদ্বয় সাতপুরার উত্তরে ও দক্ষিণে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। **নর্মদা** (১,২৮০ কি-মি. দীর্ঘ) অমরকণ্টক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া মাণ্ডলা পর্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলার পর জব্বলপুরের নিকট মার্বেল পাহাড় ভেদ করিয়া খরস্রোতা হইয়া প্রবাহিতা হইয়াছে। ইহার পর নর্মদা নদী বিন্ধ্য ও সাতপুরার মধ্যভাগের সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। ভেরাঘাটে ইহা ১৫ মি. উচ্চ হইতে নামিবার সময় জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই বিখ্যাত **নর্মদা জলপ্রপাত** বা **মার্বেল ফল্‌স্** (Marble Falls); এই নদীর তীরে মধ্যপ্রদেশের **জব্বলপুর** ও গুজরাটের **ব্রোচ** শহর অবস্থিত। **তাপ্তী (তাপী)** মহাদেব পর্বত হইতে নির্গত হইয়া সাতপুরা ও অজন্তার মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। খরস্রোতা বলিয়া তাপ্তী ও নর্মদার মোহানায় কোন ব-দ্বীপ নাই। গুজরাটের **সুরাট** বন্দর তাপ্তীর তীরে অবস্থিত। তাপ্তীর প্রধান উপনদী **পূর্ণা**। আরাবল্লী হইতে **সবরমতী** নদী উৎপন্ন হইয়া গুজরাটের উপর দিয়া দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের নদীগুলির মধ্যে **মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী** প্রধান। দক্ষিণাপথ মালভূমি পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু বলিয়া এই নদীগুলি প্রধানত পূর্ববাহিনী। **মহানদী** (৮৩২ কি-মি. দীর্ঘ) সাতপুরা পর্বতের পূর্বদিকে মধ্যপ্রদেশের উচ্চভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **ব্রাহ্মণী** ও **বৈতরণী** মহানদীর প্রধান উপনদী। মহানদীর ব-দ্বীপ বিস্তৃত। ব-দ্বীপের নিকটে **চিল্কা হ্রদ** অবস্থিত। **সম্বলপুর** মহানদীর তীরে অবস্থিত শহর। সম্বলপুরের নিকটে মহানদীতে **হীরাকুদ** নামে একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। **কটক** ব-দ্বীপ শীর্ষে অবস্থিত শহর এবং ব-দ্বীপে অবস্থিত **পুরী** সমুদ্রোপকূলবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান ও হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থ।

গোদাবরী (১,৪৪০ কি-মি. দীর্ঘ) দক্ষিণাপথের বৃহত্তম নদী। ইহা নাসিকের পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বতের ত্রিম্বক হইতে উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার ব-দ্বীপ বিস্তীর্ণ। **প্রাণহিতা** (পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা এবং বেনগঙ্গার মিলিত প্রবাহ), **ইন্দ্রাবতী, শবরী** প্রভৃতি গোদাবরীর বামতীরের উপনদী, **মঞ্জীরা**

গোদাবরীর দক্ষিণ তীরের উপনদী। গোদাবরীর বহু উপনদী দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ ভূভাগ বিধৌত করিতেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে গোদাবরীর উপনদী মঞ্জীরার উপরে বাঁধ দিয়া **নিজাম-সাগর** নামে এক বিরাট জলাধারের সৃষ্টি করা হইয়াছে। গোদাবরীর তীরে অন্ধ্রপ্রদেশের বড় শহর **রাজমুন্দ্রী** অবস্থিত। মোহানার উত্তরদিকে **কাকিনদ** বন্দর এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণার মধ্যবর্তী স্থানে **কোলেরু** হ্রদ অবস্থিত।

কৃষ্ণা (১,২৮০ কি-মি. দীর্ঘ) পশ্চিমঘাট পর্বতের মহাবালেশ্বরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও অন্ধ্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার ব-দ্বীপ গোদাবরীর ব-দ্বীপের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত। **ভীমা, তুঙ্গভদ্রা,** ঘাটপ্রভা প্রভৃতি ইহার প্রধান উপনদী। তেলেঙ্গানা মালভূমির পূর্বে কৃষ্ণা নদীতে বাঁধ দিয়া **নাগার্জুন সাগর** নামে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কৃষ্ণার তীরে মহারাষ্ট্রের **সাতারা** ও অন্ধ্রের **বিজয়ওয়াড়া** শহর অবস্থিত।

কাবেরী (৭৬০ কি-মি. দীর্ঘ) নদী পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমে কুর্গের ব্রহ্মগিরি ও কুশল নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া কর্ণাটক মালভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে ইহার গতিপথে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত ও দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। অতঃপর ইহা তামিলনাড়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার মোহানায় ব-দ্বীপ আছে। **হিমাবতী, বেদবতী, সিমসা** ও **ভবানী** কাবেরীর উপনদী। কর্ণাটক রাজ্যে কাবেরীর গতিপথে **শিবসমুদ্রম্** জলপ্রপাত ও কয়েকটি দ্বীপ আছে। **শ্রীরঙ্গপত্তম্** শহর এইরূপ একটি দ্বীপে অবস্থিত। এই রাজ্যে কাবেরী নদীতে বাঁধ দিয়া **কৃষ্ণরাজাসাগর** নামক কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই হ্রদের সহিত শিবসমুদ্রম্‌কে যুক্ত করা হইয়াছে। কাবেরীর তীরে তামিলনাড়ুর **তিরুচিরা-পল্লী, কুম্ভকোণম্, থাঞ্জাভুর** (তাঞ্জোর) প্রভৃতি শহর অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদীর মধ্যে **পেন্নার, পালার, পন্নাইয়ার** প্রভৃতি নদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। **ভাইগাই** ও **তাম্রপর্ণী** নদী পূর্ববাহিনী; **পেরিয়ার** ও **চন্দ্রগিরি** পশ্চিমবাহিনী।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে তুলনা করিলে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন, উত্তর ভারতের নদীগুলি তুষারমণ্ডিত পর্বত হইতে উৎপন্ন বলিয়া সারাবৎসর তুষারগলা জলে ও বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ থাকে। পক্ষান্তরে অনুচ্চ পর্বত হইতে উৎপন্ন বলিয়া দক্ষিণ ভারতের

নদীগুলি কেবল বর্ষাকালেই জলপূর্ণ থাকে, গ্রীষ্ম ও শীতকালে ইহাদের স্থানে স্থানে একেবারে শুকাইয়া যায়। উত্তর ভারতের নদীগুলি অপেক্ষাকৃত নবীন ও দীর্ঘ। সেই কারণে, ইহারা প্রায়ই গতি পরিবর্তন করে এবং অধিক ক্ষয়-কার্য করে। পার্বতভূমি, সমভূমি ও ব-দ্বীপ—এই তিনটি পৃথক পৃথক অংশে এই নদীগুলির কার্য বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে দক্ষিণভারতের নদীগুলি প্রাচীন ও নাতিদীর্ঘ; ইহাদের গতিপথের তিনটি অংশের কার্য স্পষ্ট দেখা যায় না। ইহাদের গতিপথ নির্দিষ্ট; ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া খরস্রোতা, সেই কারণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পক্ষে ইহারা খুব উপযোগী। উত্তর ভারতের নদীগুলি বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। উত্তর ভারতের নদীগুলির এক বিরাট অংশ সমতলভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; নদীখাত প্রশস্ত ও গভীর। এই সকল কারণে ইহারা নৌবাহনযোগ্য; জলসেচ ও বাণিজ্যের পক্ষে ইহারা উপযুক্ত। দক্ষিণভারতের নদীগুলি অত্যন্ত খরস্রোতা। ইহা ব্যতীত, সারাবৎসর সমপরিমাণ জল থাকে না বলিয়া ইহারা নৌ-চলাচল, জলসেচ ও বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। উত্তর ভারতের নদীগুলির তীরে বড় নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই তুলনায় দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির তীরে বড় নগরের সংখ্যা খুব কম।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতের জলবায়ু

ভারত দেশটি যেমন বিশাল তেমনি বিচিত্র ইহার জলবায়ু। এই দেশের কোথাও পার্বতভূমি, কোথাও মালভূমি, কোথাও বা সমভূমি। কোন স্থান সমুদ্রের নিকটে আবার কোন স্থান সমুদ্র হইতে বহু দূরে অবস্থিত। দার্জিলিং, নৈনিতাল, মুসৌরী, সিমলা, উতকামণ্ড, শিলং প্রভৃতি পার্বত শহরের জলবায়ু **শীতল**। পুরী সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত বলিয়া ইহার জলবায়ু **সমভাবাপন্ন** অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীত প্রখর নহে, কিন্তু অমৃতসর সমুদ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া ইহার জলবায়ু **চরমভাবাপন্ন** অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীত উভয়ই প্রখর। ভারতের কোন স্থানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, আবার কোন স্থানে বৃষ্টিপাত খুব কম। থর মরুভূমিতে বৎসরে ১৩ সেন্টিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু চেরাপুঞ্জীতে বৎসরে ১,২৬৯ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। রাজস্থানের জলবায়ু শুষ্ক, আসামের জলবায়ু আর্দ্র। কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩½° উঃ অঃ) ভারতের প্রায় মধ্যভাগ দিয়া

গ্রীষ্মকালে ভারতের
উষ্ণতা ও বায়ুপ্রবাহ
কি.মি.
০ ৬০০
দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমী বায়ু
উষ্ণতা
২৬·৬৬° সেন্টিগ্রেডের কম
২৬·৬৬°-২৯·৪৪° সে.
২৯·৪৪°-৩২·২২° সে.
৩২·২২° সেন্টিগ্রেডের অধিক
শীতকালে ভারতের
উষ্ণতা ও বায়ুপ্রবাহ
কি.মি.
০ ৬০০
উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু
উষ্ণতা
১২·৭৭° সেন্টিগ্রেডের কম
১২·৭৭°-১৫·৫৫° সে.
১৫·৫৫-১৮·৩৩° সে.
১৮·৩৩°-২১·১১° সে.
২১·১১°-২৩·৮৮° সে
২৩·৮৮°-২৬·৬৬ সে.
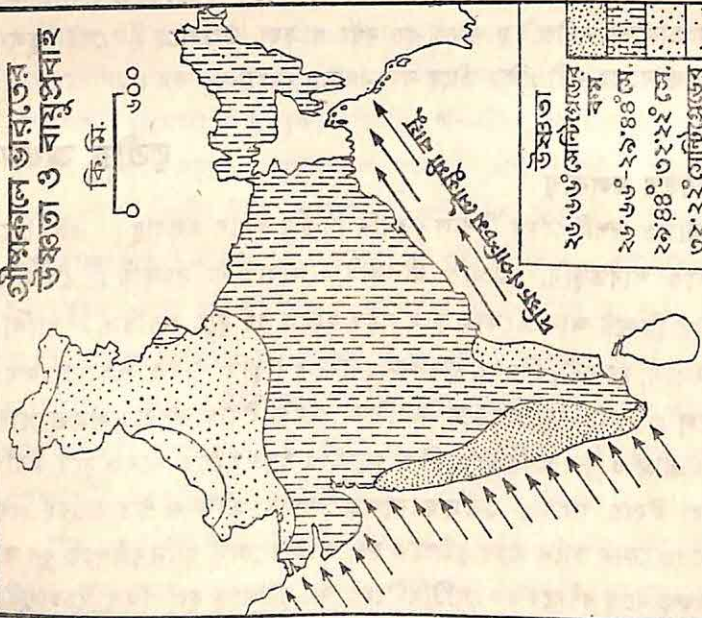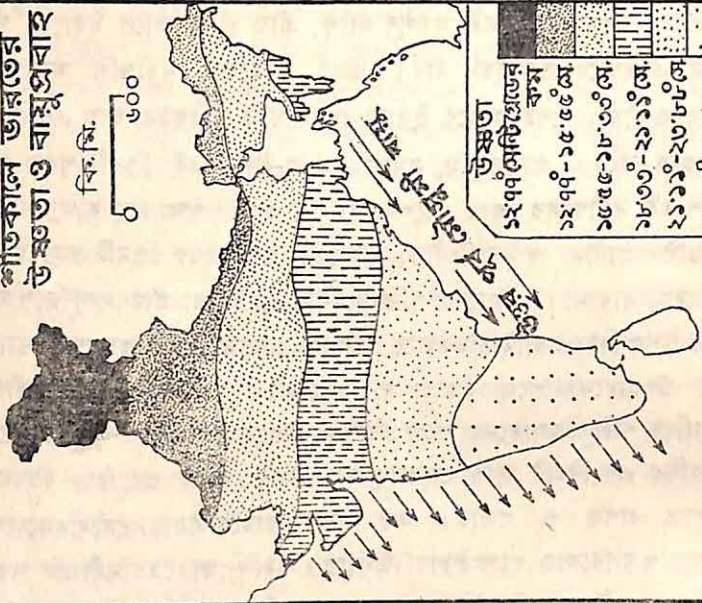
গিয়াছে। সুতরাং **অক্ষাংশ** অনুসারে ভারতের উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এবং দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু দক্ষিণ ভারত উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হইলেও **উচ্চতা** এবং **সমুদ্র-সান্নিধ্য**হেতু এখানে গ্রীষ্মকালে তাপের মাত্রা যত হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা অনেক কম হয়। প্রধানত অক্ষাংশ, ভূমির উচ্চতা, সমুদ্রসান্নিধ্য, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ফলে ভারতের জলবায়ুর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

তাপমাত্রা—ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে সূর্য নিরক্ষরেখার দক্ষিণে মকর-ক্রান্তির (২৩½° দঃ অঃ) নিকটে থাকে বলিয়া নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত ভারতে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পতিত হয়। ভারতে তখন **শীতকাল**। তথাপি উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারত নিরক্ষরেখার নিকটে অবস্থিত বলিয়া সেখানকার তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী। তামিলনাড়ুতে শীতকালে তাপমাত্রা ২৪°—২৬° সেন্টিগ্রেড, পাঞ্জাবে তখন ১৩°—১৮° সেন্টিগ্রেড। জুন-জুলাই মাসে নিরক্ষ রেখার উত্তরে কর্কটক্রান্তির (২৩½° উঃ অঃ) নিকটবর্তী স্থানে সূর্য-রশ্মি প্রায় লম্বভাবে পতিত হয়। সেই কারণে ভারতের অধিকাংশ স্থান তখন উত্তপ্ত হয়। ভারতে তখন **গ্রীষ্মকাল**। উত্তর-পশ্চিম ভারতের তাপমাত্রা অধিক হয়। দার্জিলিং (২,১৩৩ মি.) উচ্চে অবস্থিত এবং কলিকাতা সমভূমিতে অবস্থিত। সুতরাং গ্রীষ্মকালে কলিকাতা অপেক্ষা দার্জিলিং অধিকতর শীতল থাকে। নীলগিরি পর্বতের উতকামণ্ডের (২,১৩২ মি.) তাপ গ্রীষ্মকালে ১৩·৯° সে. এবং শীতকালে ১২·২° সে., পার্থক্য মাত্র ১·৭° সে.। সমুদ্র নিকটবর্তী বলিয়া শীত ও গ্রীষ্মের তাপের প্রভেদ কম। পক্ষান্তরে সিমলার (২,১৯৫ মি.) শীত ও গ্রীষ্মে তাপের পার্থক্য ১৪·৪° সে.। কারণ, সিমলা সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত। কলিকাতা, পুরী, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহর সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত, তাই এই সকল শহরে শীত ও গ্রীষ্ম তেমন প্রখর হয় না। কিন্তু সেই তুলনায় অমৃতসর, দিল্লী, আগ্রা, নাগপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি শহর সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত, তাই এই সকল শহরে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই তীব্র।

বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত—ভারত **মৌসুমী** জলবায়ুর দেশ। এই জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য—গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিবহুল, শীতকাল বৃষ্টিবিরল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। প্রধানত এই দুই বায়ুপ্রবাহের উপরই ভারতের বৃষ্টিপাত এবং জলবায়ু নির্ভর করে। **গ্রীষ্মকালে** সূর্য যখন কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ

ভারতের বৃষ্টিপাত
(জুন হইতে অক্টোবর)
কি.মি.
০
৬০০
বৃষ্টিপাত
২৫০ সেন্টি মিটারের অধিক
১২৫ - ২৫০ সে. মি.
৭৫ - ১২৫ সে.মি.
২৫ - ৭৫ সে.মি.
২৫ সে. মি এর কম
ভারতের বৃষ্টিপাত
(নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী)
কি.মি.
০
৬০০
বৃষ্টিপাত
২৫সেন্টিমিটারের অধিক
১৩ - ২৫ সে. মি.
৬ - ১৩ সে. মি.
৩ - ৬ সে. মি.
৩ সে.মি এর কম
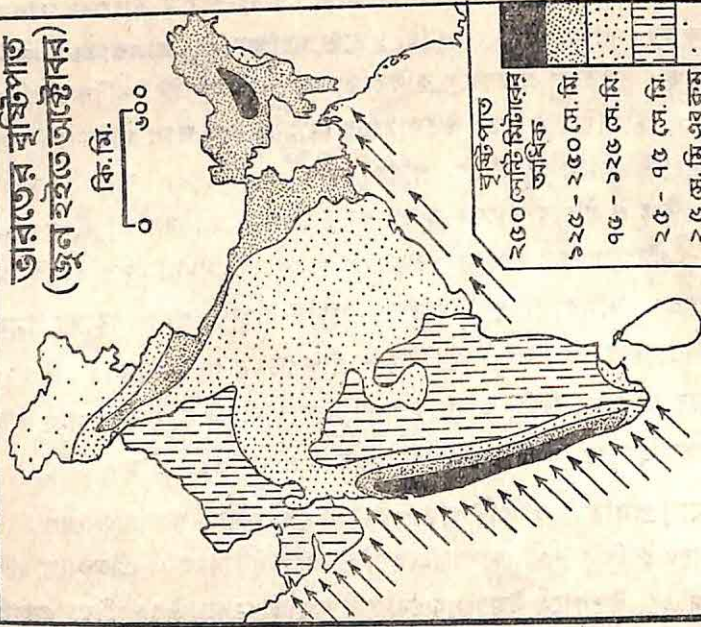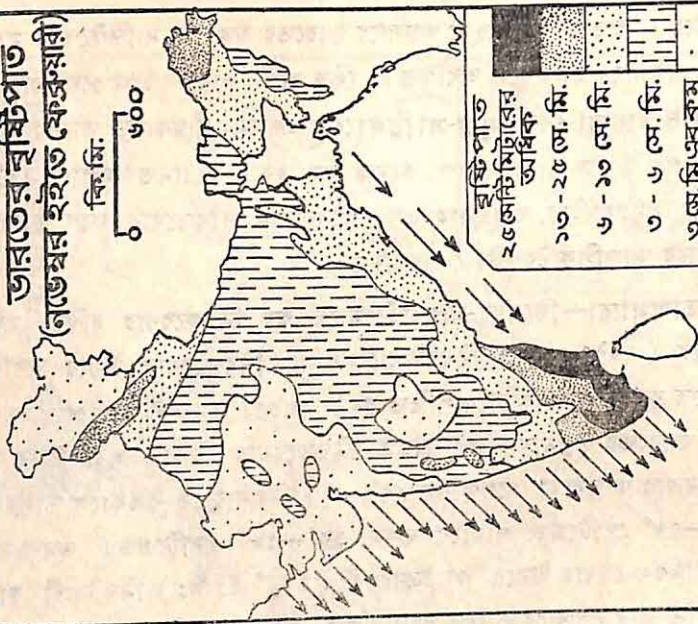
দেয় তখন উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শুষ্ক অঞ্চলের বায়ু অধিক উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং বায়ুমণ্ডলে **নিম্নচাপের** সৃষ্টি করে। তখন দক্ষিণের ভারত মহাসাগর হইতে জলীয় বাষ্পপূর্ণ **উচ্চচাপের** বায়ু নিম্নচাপের বায়ুর দিকে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করিবার পর সোজাসুজি উত্তর-দক্ষিণ না হইয়া **ফেরেল সূত্র*** অনুসারে উহা ডানদিকে (প্রবাহিত উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ুর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে) বাঁকিয়া যায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুতে পরিণত হইয়া ভারতের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। ইহাই গ্রীষ্মকালের **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু** নামে পরিচিত। ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে এই বায়ুর পরিবর্তন হয় বলিয়া ইহাকে **মৌসুমী বায়ু** বলা হয়। আরবীয়-ভাষায় মৌসিম শব্দের অর্থ ঋতু। মৌসুমী বায়ু দুই শাখায় বিভক্ত হয়। যথা—(১) **আরব সাগরের** উপর দিয়া প্রবাহিত শাখা এবং (২) **বঙ্গোপসাগরের** উপর দিয়া প্রবাহিত শাখা।

আরব সাগর হইতে যে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার একাংশ পশ্চিমঘাট পর্বতে বাধা পাইয়া পর্বতের প্রতিবাত পার্শ্বে পশ্চিম উপকূলে প্রচুর (২০০—৫০০ সেন্টিমিটার) বারিবর্ষণ করে। কিন্তু সুরাটের উত্তরে এবং ত্রিবান্দ্রমের দক্ষিণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম। পশ্চিম উপকূলের এই প্রকার বৃষ্টিপাতকে **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি** (Relief Rain) বলে। পশ্চিমঘাট পর্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উপর পৌছাইলে এই বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প কম থাকে বলিয়া এই অঞ্চলে ৬০—৭০ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। ফলে দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে পশ্চিম ঘাট পর্বতের অনুবাত পার্শ্ব **বৃষ্টিচ্ছায়** অঞ্চলে (Rain Shadow) পরিণত হইয়াছে।

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

আরব সাগর হইতে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর এক শাখা বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতে বাধা পাইলে নর্মদা

*পৃথিবীর আবর্তনের ফলে এবং বিষুববৃত্তের গতিবেগ ক্রান্তীয় গতিবেগ অপেক্ষা অধিক হওয়ায় উত্তর গোলার্ধে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে আসিবার সময় আয়ন বায়ু ডানদিকে বাঁকিয়া উত্তর-পূর্বদিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বাঁকিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিক হইতে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। ইহাই ফেরেলের সূত্র বা নিয়ম (Ferrel's Law)।

ও তাপ্তী উপত্যকায় মধ্যম রকমের বৃষ্টিপাত (১২৫ সে.মি.) হয়। আরব সাগর হইতে প্রবাহিত অপর এক শাখা রাজস্থানের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে যাইবার সময় আরাবল্লী পর্বতে বাধা পাইয়া পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে (প্রতিবাত পার্শ্বে) কিছু বারিবর্ষণ করে। কিন্তু পর্বত তেমন উচ্চ নহে বলিয়া এবং অত্যধিক উত্তাপের জন্য অপর পার্শ্বে (অনুবাত পার্শ্বে) সামান্য বারি বর্ষণ হয়। অল্প বৃষ্টিপাতের জন্য অপর অংশের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে মরুভূমির (**থর**) সৃষ্টি হইয়াছে। পাঞ্জাবের উত্তর-পূর্বাংশে হিমালয়ের পার্বত ভূমিতে বাধা পাইয়া এই বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয় এবং কিছু বারিবর্ষণ করে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা উত্তর-পূর্বে মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে বাধা পাইয়া হঠাৎ ১,২১৮ মি. উর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং শৈত্যে ঘনীভূত হইয়া পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত চেরাপুঞ্জীতে অধিক বারিবর্ষণ করে। **চেরাপুঞ্জীতে** গড় বার্ষিক ১,২৬৯ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু চেরাপুঞ্জীর নিকটে **মৌসিনরাম** গ্রামে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত হয় (১,৭২৭·৫ সে-মি·)। চেরাপুঞ্জীর অপর পার্শ্বে **শিলং** শহরে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত মাত্র ২০৮ সেন্টিমিটার; কারণ ইহা বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত। এই বঙ্গোপসাগরীয় শাখা হিমালয়ে বাধা পাইয়া পশ্চিমে বাঁকিয়া আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশের মধ্য দিয়া বারিবর্ষণ করিতে করিতে কাশ্মীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ইহা যতই পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকে ততই ইহার জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে; ফলে বৃষ্টিপাত কম হয়। যথা— দার্জিলিং-এ ৩০৫ সে-মি., গৌহাটিতে ১৭০ সে-মি., কলিকাতায় ১৫২·৫ সে-মি., পাটনায় ১১৪ সে-মি., এলাহাবাদে ১০২ সে-মি., লক্ষ্ণৌয়ে ৯৯ সে-মি. এবং দিল্লীতে ৭১ সে-মি., কাশ্মীরে ৫০ সে-মি. অপেক্ষা কম। ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর দান।

শীতকালে সূর্য যখন মকরক্রান্তীয় অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয় তখন ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের বায়ু প্রখর সূর্য কিরণে উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। উত্তরের স্থলভাগ হইতে শুষ্ক শীতল বায়ু ভারত মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়। ইহাকে **শীতের উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু** বলে। ইহা শীতল স্থলভাগের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাতে জলীয় বাষ্প থাকে না। এই শীতের মৌসুমী বায়ু যখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তখন ইহা সাগর হইতে প্রচুর জলীয় বাষ্প আহরণ করে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে

থাকে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর চাপে এই দুর্বল বায়ু আর উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে না পারিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ফিরিয়া আসে। ইহাকে **দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তন (Retreating of S. W. Monsoon)** বলা হয়। এইরূপ প্রত্যাবর্তনের ফলে অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তামিলনাড়ুর উপকূলে ৫০ সেন্টিমিটারের অধিক বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হয়। তামিলনাড়ুতে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয়।

দক্ষিণ সহ্যাদ্রির পশ্চিমাংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা গ্রীষ্মকালে এবং পূর্বাংশের প্রত্যাবর্তনকারী মৌসুমী বায়ু দ্বারা **শীতকালে** বৃষ্টিপাত হয়। নিম্ন অক্ষাংশে অবস্থান হেতু তামিলনাড়ুর জলবায়ু **কতকটা উষ্ণমণ্ডলীয়** জলবায়ুর (Tropical) ন্যায় হইলেও **সমুদ্র** সান্নিধ্যের **জন্য** এখানে গ্রীষ্ম ও শীতের তীব্রতা কম অনুভূত হয়। এই রাজ্যের উভয় দিকে সমুদ্রের প্রভাব বেশী। শীতকালে ভারতের অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। ভূমধ্যসাগরীয় ঘূর্ণবাতের বায়ুতরঙ্গ পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং এই জলীয় বাষ্পভরা বায়ুতে শীতকালে তথায় কিছু বৃষ্টিপাত হয় এবং হিমালয় অঞ্চলে তুষারপাত হয়। পশ্চিম দিকের **ঘূর্ণবাত** (Western Disturbances) বা পশ্চিমা বায়ু **শীতকালে** উত্তর-পশ্চিম ভারতে বারিবর্ষণ করে। মৌসুমী বায়ুর দিক পরিবর্তন করিবার সময় অর্থাৎ মে এবং অক্টোবর মাসে কখনো কখনো বজ্রপাত সহ ঝড় বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ও উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর পরস্পর সংঘর্ষণ বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের সৃষ্টির কারণ। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গে এই ঝড় বৃষ্টি **কালবৈশাখী** (Nor'wester) এবং শরতের শেষে **আশ্বিনের ঝড়** নামে অভিহিত হয়।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞগণের মতে বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও তাপের তারতম্য অনুসারে ভারতে বিভিন্ন ঋতুর সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মতে ভারতে **চারিটি** ঋতু। যথা—

(১) **শীতকাল** (ডিসেম্বর—ফেব্রুয়ারী)। (২) **গ্রীষ্মকাল** (মার্চ—মে) বা মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের পূর্ববর্তী কাল। (৩) **বর্ষাকাল** (জুন—সেপ্টেম্বর) বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের কাল। (৪) **শরৎকাল** (অক্টোবর—নভেম্বর) বা গ্রীষ্ম মৌসুমী বায়ুর প্রত্যাবর্তনের কাল।

জলবায়ু অনুসারে ভারতকে ৮টি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) **নিম্নগাঙ্গেয় সমভূমি ও আসাম** উপত্যকা গ্রীষ্মকালে কিছু উত্তপ্ত

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু
০ স্কেল ৪০০
কিলোমিটার
৭২°
৮০°
৮৮°
৯৬°
৩২°
২৪°
১৬°
৮°
শীত ও
গ্রীষ্ম
উভয় ঋতুতেই
বৃষ্টিগড় ৬৫ সে.মি.
জানুয়ারী মাসে
গড় উষ্ণতা
১২·৭৭° সে.
এর কম
মরুভূমি
বৃষ্টিপাত
১৩ সে.মি.এর কম
উষ্ণতা গ্রীষ্মে ও
শীতে গড় তাপ
১৪° - ১৭° সে.
বৃষ্টিপাত
মধ্যম, গ্রীষ্মে
অত্যন্ত উষ্ণ এবং
শুষ্ক, জানুয়ারী
মাসের গড় উষ্ণতা
১২·৭৭° সে. হইতে
১৮·৩৩° সে.
বৃষ্টিপাত মধ্যম
জানুয়ারী মাসের
গড় উষ্ণতা
১৮·৩৩° সে.হইতে
২৩·৮৮° সে.
বৃষ্টিপাত
৫০ - ১০০ সে.মি.
বৃষ্টিপাত অধিক
গড় উষ্ণতা ৩৭·৮০° সে.
শীতে ১৬° সে., বৃষ্টিপাত
১৫০ - ২০৩ সে.মি.
অত্যধিক বৃষ্টিপাত
২০৩ সে.মি.
এর বেশী
আরব
সাগর
বঙ্গোপসাগর
শ্রীলঙ্কা
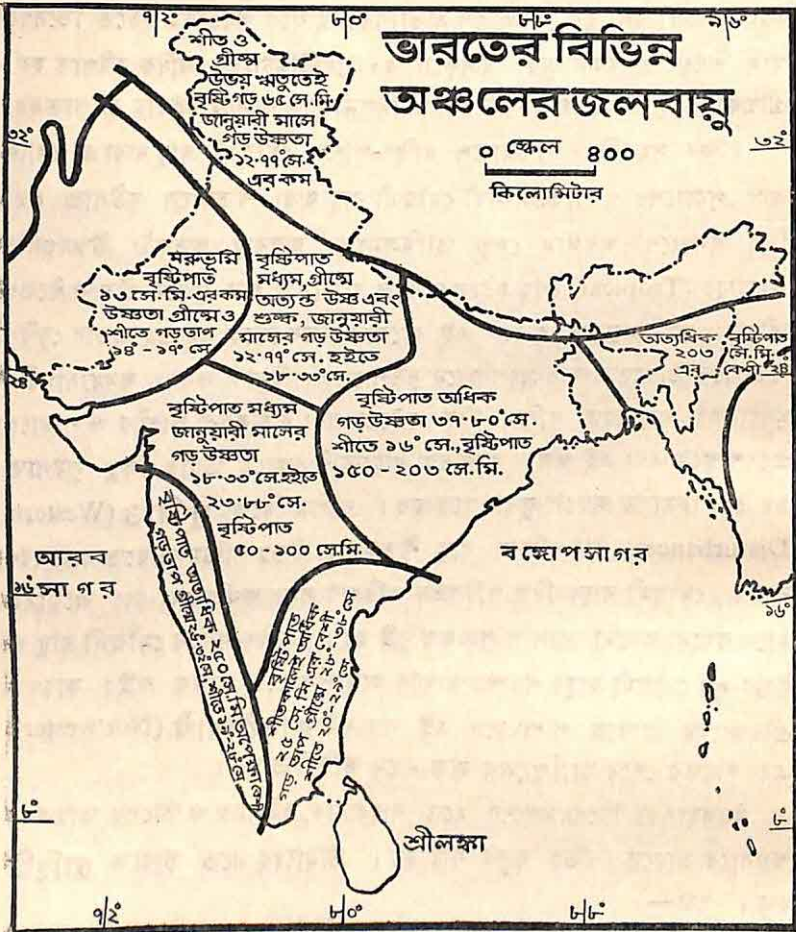
ও আর্দ্র থাকে। পশ্চিমবঙ্গে শীতকালের তাপমাত্রা ১৭°—২১° সে. এবং গ্রীষ্মকালের ৩২°—৪০° সে.; পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে, পূর্ব হিমালয়ের পার্বতঅঞ্চল ও তরাই-এ, আসাম ও মেঘালয়ে প্রচুর বারিবর্ষণ হেতু (২০৩ সেন্টিমিটারের অধিক) উত্তাপ প্রখর হয় না। সুতরাং এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র ও উষ্ণ। আসামের জলবায়ু আর্দ্র। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে ও উড়িষ্যার উপকূলে সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু শীত ও গ্রীষ্মের প্রখরতা কম।

(২) **বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ** প্রভৃতি রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বৃষ্টিপাত কম, বায়ু শুষ্ক; বৃষ্টিপাত ১৫০—২০৩ সে-মি.। গ্রীষ্মে গড় তাপ ৩৭·৮° সেন্টিগ্রেড, শীতে ১৬° সে.। মধ্যপ্রদেশে গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ৩৮°—৪৩° সেন্টিগ্রেড।

(৩) **রাজস্থান** বৃষ্টিপাতের অভাবে অতিশয় শুষ্ক, ইহার পশ্চিমাংশের জলবায়ু মরুদেশীয়। গ্রীষ্ম ও শীতে তাপের তারতম্য ১৪°—১৭° সেন্টিগ্রেড; মরুস্থলীতে ১৩ সে-মি. অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত হয়।

(৪) **পাঞ্জাবের কতক** অংশে গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুতেই বৃষ্টিপাত হয় (৭০ সেন্টিমিটারের কম)। জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। জানুয়ারী মাসে গড় তাপ ১২·৮° সেন্টিগ্রেডের নিম্নে থাকে।

(৫) **দক্ষিণাপথ মালভূমি**—উচ্চতা ও সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু নিম্ন অক্ষাংশ সত্ত্বেও এই অঞ্চলের গ্রীষ্ম তীব্র নহে। গড় তাপ ১৮°—২৪° সেন্টিগ্রেড; মালভূমির মধ্যভাগের বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ৫০—১০০ সে-মি.।

(৬) **উপকূলের সমভূমি** অঞ্চলে সমুদ্র সান্নিধ্য হেতু শীত ও গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ বা সমভাবাপন্ন। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয়; কিন্তু পূর্ব উপকূলের দক্ষিণাংশে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালেই বেশি বৃষ্টি হয়। পূর্ব উপকূলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০—১৩০ সেন্টিমিটার। পশ্চিমদিকের কঙ্কন উপকূলে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৮০ সে-মি., কর্ণাটকে ৩১০ সে-মি. এবং মালাবার উপকূলে ৩৫০ সে-মি.।

(৭) **হিমালয়ের পাদদেশের** জলবায়ু উষ্ণ ও প্রচুর বারিবর্ষণহেতু (২৫০ সে-মি.) আর্দ্র থাকে। উত্তাপ প্রখর হয় না।

(৮) **হিমালয়ের উচ্চ পার্বতপ্রদেশ** উচ্চতার জন্য সারাবৎসরই শীতল থাকে। সেখানে পার্বত জলবায়ু (Alpine type)। শীতকালে তুষারপাত হয়। উচ্চতা হেতু কাশ্মীরের জলবায়ু শীতল, গ্রীষ্মকাল আরামদায়ক। পশ্চিমাবায়ুর প্রভাবে কাশ্মীরে শীতকালে বৃষ্টিপাত কিছু বেশী হয়। এখানকার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫০—৬৫ সে-মি.।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রথম পাঠ

স্বাভাবিক উদ্ভিদ্-অঞ্চল

যে উদ্ভিদ্ নিজ হইতে মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ বলে। ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপর স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ নির্ভর করে।

ভারতের বনভূমির আয়তন ৭·৪৬ কোটি হেক্টেয়ার। ইহা ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তনের শতকরা ২২·৭ ভাগ। এই বনভূমির শতকরা ১৫—২০ ভাগ হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে ও পাদদেশে, শতকরা ৭৫ ভাগ দক্ষিণ ভারতের

মালভূমি এবং পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পার্বত অঞ্চলে, অবশিষ্ট সামান্য অংশ সমতলভূমিতে দেখা যায়। বনভূমি ভারতের বহুমূল্য সম্পদ্। বন হইতে গড় আয়ের পরিমাণ প্রতি বৎসর প্রায় ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ত্রিপুরা, সুন্দরবন, তরাই অঞ্চলে এবং আসাম, মেঘালয়, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে বনভূমি আছে। যেখানে বৃষ্টিপাত প্রচুর সাধারণত সেখানে নানারকম গাছপালা জন্মিয়া বনভূমির সৃষ্টি করে। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের বনভূমি দেখা যায়। ভারতের বনভূমিকে নিম্নলিখিত স্বাভাবিক উদ্ভিদ্ অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) **চিরহরিৎ অরণ্য অঞ্চল ঃ** পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশের তরাই অঞ্চলে, উত্তরবঙ্গ ও আসামের বনাঞ্চলে (**ডুয়ার্স**), মেঘালয়, নাগাভূমি, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, পশ্চিমঘাট পর্বতের পশ্চিমঢালে এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে **চিরহরিৎ** বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই সকল অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ২৫০ সে-মি.-এর অধিক। এই সকল বনভূমিতে **আবলুস, মেহগনি, শিশু, গর্জন, তুন, চাপলাস, রোজউড, রবার, ফার্ন** প্রভৃতি চিরহরিৎ বৃক্ষের নিবিড় অরণ্য দেখা যায়। ইহাদের পাতা কখনও ঝরিয়া পড়ে না। ইহাদের কাষ্ঠ শক্ত ও স্থায়ী। এই সকল কাষ্ঠদ্বারা মূল্যবান আসবাবপত্র তৈয়ারি হয়। গর্জন কাষ্ঠের দ্বারা রেলপথের তক্তা (Sleepers) তৈয়ারি হয়।

(২) **মৌসুমী অরণ্য অঞ্চল ঃ** ভারতের বনভূমির মোট আয়তনের প্রায় অর্ধেক মৌসুমী বনভূমি। হিমালয়ের পাদদেশ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমভাগে, ছোটনাগপুর মালভূমিতে, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে মৌসুমী বনভূমি আছে। এই সকল অঞ্চলে ১০১—২০৩ সে-মি. বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমী বনভূমির বেশীর ভাগ বৃক্ষ **পর্ণমোচী** জাতীয়। এই প্রকার বনে **শাল, সেগুন, চন্দন, অর্জুন, জারুল, গামাইর, আবলুস, খদির, শিরীষ, পলাশ, হলদু, ছাতিম, পিটুলি, হরিতকী, বট, অশ্বত্থ, বাঁশ, বেত,** আম, জাম, প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। ছোটনাগপুর মালভূমিতে শিমুল, **মহুয়া**, কুল, কুসুম, পলাশ প্রভৃতি গাছ জন্মে। শীতকালে ইহাদের পাতা ঝরিয়া পড়ে। নীলগিরি ও দার্জিলিং অঞ্চলে **সিঙ্কোনা** এবং মেঘালয়ে **ইউক্যালিপ্‌টাস** গাছ জন্মে। মহুয়া ও ইউক্যালিপ্‌টাস হইতে তৈল এবং সিঙ্কোনা গাছের বাকল হইতে

কুইনাইন প্রস্তুত হয়। **সেগুন** ও **শাল** বৃক্ষের উৎকৃষ্ট মজবুত কাষ্ঠ দ্বারা গৃহের নানাপ্রকার আসবাব ও রেল লাইনের তক্তা তৈয়ারি হয়। আসবাবপত্র, দরজা, জানালা ব্যতীত রেলগাড়ী, জাহাজ প্রভৃতি নির্মাণে সেগুনকাঠ ব্যবহৃত হয়। **চন্দন** কাঠ দ্বারা নানাপ্রকার সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, **আবলুস** কাঠ দ্বারা চমৎকার আসবাবপত্র এবং **শিমুল, ছাতিম** প্রভৃতি গাছের কাঠ হইতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও প্যাকিং বাক্স তৈয়ারি হয়। পলাশ, কুল, কুসুম প্রভৃতি গাছের শাখা হইতে **লাক্ষা** সংগ্রহ করা হয়। তুঁত ও কুলের পাতা রেশম-কীটের খাদ্য। তুঁতগাছে **রেশমগুটির** চাষ হয়। মৌসুমী অরণ্যে **বাঁশ,** বেতও প্রচুর জন্মে। গৃহ নির্মাণ কার্যে বাঁশ, বেত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বাঁশের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত, এই বনভূমির অনেক গাছের নিকৃষ্ট কাঠ জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৩) **তৃণভূমি ও গুল্মজাতীয় বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চল :** পশ্চিম ভারতের যে সকল স্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সেন্টিমিটারের কম সেই সকল স্থানে ছোট ছোট কাঁটাঝোপের বন বা **গুল্মভূমি** আছে। দক্ষিণাপথ মালভূমির মধ্যভাগে ও রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্বাংশে সাভানা জাতীয় **তৃণভূমি** আছে। মাঝে মাঝে দুই একটি পর্ণমোচী বৃক্ষও দেখা যায়। রাজস্থানে খেজুর গাছ জন্মে। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে **সাবাই ঘাস** জন্মে। এই ঘাস হইতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারি হয়।

(৪) **মরু ও মরুপ্রায় অঞ্চলের অরণ্য অঞ্চল :** রাজস্থান ও পাঞ্জাবের শুষ্ক অঞ্চলে এই জাতীয় বনভূমি আছে। এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামান্য, ৫০ সেন্টিমিটারের কম। এই অঞ্চলের বনে সামান্য তৃণ এবং বৃক্ষের মধ্যে **বাবলা, ফণিমনসা, তেশিরা মনসা** প্রভৃতি কাঁটা গাছ জন্মে। কাঁটাগাছগুলি হইতে গঁদ সংগ্রহ করা হয়। ইহাদের কাষ্ঠ, ছাল প্রভৃতি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
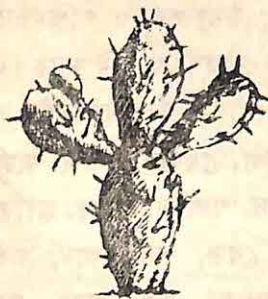
ফণিমনসা

(৫) **ব-দ্বীপীয় ও উপকূলবর্তী অরণ্য অঞ্চল :** বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ও নদীর ব-দ্বীপীয় বনভূমিতে সমুদ্রের লবণাক্ত জল দ্বারা প্লাবিত স্থানে পাম জাতীয় **তাল, খেজুর, নারিকেল, সুপারি** ও

ম্যানগ্রোভ জাতীয় **সুন্দরী** বৃক্ষ জন্মে। ইহা ভিন্ন, এই প্রকার বনে **গেঁউয়া, গরাণ, কেয়া** প্রভৃতি গাছ জন্মে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনে, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলের জলাভূমিতে অরণ্য দেখা যায়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রতীরের বালুকাময় ভূমিতে নারিকেল, সুপারি, তাল, ঝাউ জাতীয় **ক্যাসুরিনা** বৃক্ষ জন্মে।

(৬) **পার্বত অরণ্য অঞ্চল ঃ** হিমালয় পর্বতগাত্রে বিভিন্ন উচ্চতায় তাপ ও বৃষ্টিপাতের তারতম্য হেতু জলবায়ুরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই কারণে হিমালয়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। বৃষ্টিপাতের তারতম্য অনুসারে হিমালয়ের দুই অংশে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের কিছু তারতম্য দেখা যায়।

(ক) পূর্ব হিমালয়ের বনভূমি—হিমালয়ের পাদদেশে **তরাই**-এর বনভূমিতে শাল, সেগুন, শিশু, শিমুল, জারুল, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। পর্বতের পাদদেশ হইতে ১,৫২৫ মিটার পর্যন্ত পর্বতঢালে **চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী** বৃক্ষের অরণ্য দেখা যায়। এখানে বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটারের অধিক। আরও
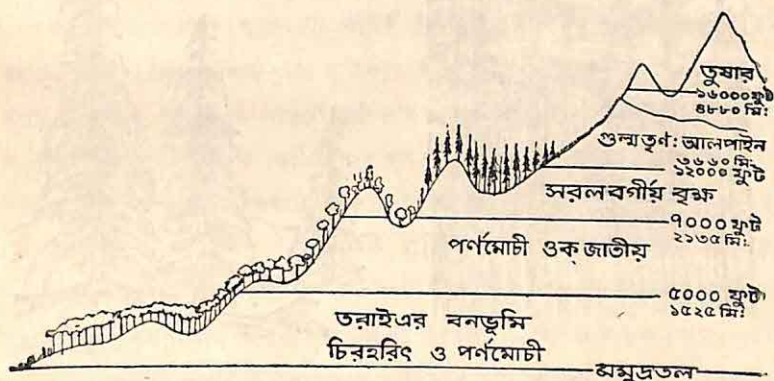
পূর্ব হিমালয়ের স্বাভাবিক উদ্ভিজ

ঊর্ধ্বে (১,৫২৫ মি.—২,১৩৫ মি. পর্যন্ত) **ওক্, ম্যাপল, পপ্‌লার, লরেল, এলম্, চেস্ট্‌নাট, সিডার, বার্চ** প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে। এই সকল বৃক্ষের মূল্যবান কাষ্ঠের দ্বারা আসবাবপত্র তৈয়ারি হয়। ২,১৩৫ মি.—৩,৬৬০ মি.পর্যন্ত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে **পাইন, ফার, চীর, দেবদারু, স্প্রুস** প্রভৃতি **সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনভূমি** দেখা যায়। এই সকল

বৃক্ষের কাঠ নরম বলিয়া ইহা দ্বারা দিয়াশলাইয়ের কাঠি ও কাগজের মণ্ড তৈয়ারি হয়। পাইন গাছের স্থরাসার হইতে তার্পিন তৈল, ধুনা, রজন প্রস্তুত হয়। ৩,৬৬০ মি.—৪,৮০০ মি. পর্যন্ত গুল্মতৃণ ও **আল্পীয়** বৃক্ষের বন দেখা যায়। **রডোডেনড্রন, জুনিপার,** নানাবিধ **ভেষজ বৃক্ষ ও বন্যফুলের গাছ** এই অঞ্চলে জন্মে। ৪,৮০০ মিটারের ঊর্ধ্বে হিমালয় চিরতুষারাবৃত। স্থতরাং এই অঞ্চলে কোন বৃক্ষ বা তৃণগুল্মাদি জন্মিতে পারে না।

(খ) **পশ্চিম হিমালয়ের বনভূমি**—পশ্চিম হিমালয়ের পর্বতঢালে ৯১৫ মি.—১,৮২৯ মি.পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অল্প বলিয়া শুষ্ক অঞ্চলের বৃক্ষই অধিক জন্মে। নদী ও ঝরনার ধারে কিছু **পর্ণমোচী** বৃক্ষ দেখা যায়। **চীর, পাইন** প্রভৃতি এই বনের প্রধান বৃক্ষ। ১,৮২৯মি.—৩,৬৬০ মি. পর্যন্ত উচ্চতায় **দেবদারু, নীল পাইন, স্প্রুস, রূপালি ফার, সিডার** প্রভৃতি **সরলবর্গীয়** বৃক্ষের বন দেখা যায়। ৪,৮০০ মি. পর্যন্ত পর্বতঢালে রডোডেনড্রন, জুনিপার ও নানাপ্রকার ফুলের গাছ দেখা যায়। ৪,৮০০ মিটারের ঊর্ধ্বে চিরতুষারাবৃত অঞ্চল।

পাইন

ফার

বনজ সম্পদের ব্যবহার—ভারতের বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব সমধিক। বনভূমির প্রধান সম্পদ কাষ্ঠ। ইহা ছাড়া,

অরণ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার, মহিষ, নানাজাতের হরিণ প্রভৃতি জন্তু বাস করে। শিকারীরা এই সকল পশু নির্বিচারে শিকার করায় বংশ লোপের আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই হেতু বন্য জন্তু সংরক্ষণের জন্য আজকাল অভয়ারণ্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শুধু পশু নহে, নানা জাতের পাখীও অরণ্যে বাস করে। নানারকম ফলমূল, পশুচর্ম, চর্বি, শিং, হাতীর দাঁত, কস্তুরী, মোম, মধু, লাক্ষা, রবার, তার্পিন তৈল, রেশমের গুটি, কার্পাস প্রভৃতি নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। **কাষ্ঠ শিল্পের** (Lumber industry) জন্য কাঁচামাল হিসাবে বনের নানারকন কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়। বনভূমি অঞ্চলে নানারকম **ভেষজ** বৃক্ষ ও লতাগুল্ম ইত্যাদি জন্মে। ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন আছে। বনজ সম্পদ আহরণ করিয়া প্রায় দশলক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করে। ভারত সরকার বনভূমির কতক অংশ সংরক্ষণ করেন, কারণ বনজ সম্পদের দ্বারা সরকারের প্রতিবৎসর আয় বৃদ্ধি হয়। এই উদ্দেশ্যে দেরাদুনে একটি **অরণ্য গবেষণাগার** স্থাপিত হইয়াছে। বনজ সম্পদ নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৪-'৭৫ খ্রীস্টাব্দে বনভূমি হইতে আহরিত দ্রব্যের মূল্য ৫৮·৫৬ কোটি টাকা।

আজকাল অনেক স্থানে বনভূমির বৃক্ষ ছেদন করিয়া কৃষিকার্যের ব্যবস্থা হইতেছে। বৃক্ষের শিকড় দ্বারা মৃত্তিকার কণাগুলি পরস্পরের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ থাকে। কিন্তু বৃক্ষ ছেদন করিলে বৃষ্টি ও বন্যার জলে, সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে ও মরু অঞ্চলের বালিতে ভূমির ক্ষয় হয়। বিভিন্ন স্থানে ঘাস লাগাইয়া ও গাছের চারা পুঁতিয়া মৃত্তিকার ক্ষয় নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে হাজারিবাগ জেলার দেওচন্দা নামক স্থানে একটি **মৃত্তিকা সংরক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র** স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভূমি-ক্ষয় নিবারণের জন্য প্রতি বৎসর একবার **বন মহোৎসব** পালন করিয়া বৃক্ষ রোপণ করা হয়। একদিকে বৃক্ষ রোপণ করা যেমন প্রয়োজন অপরদিকে বনাঞ্চলের অভ্যন্তরে যাতায়াতের সুব্যবস্থা থাকাও অত্যাবশ্যক। বনভূমির মূল্যবান বৃক্ষগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা, বনজ সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি ও কাষ্ঠ আহরণের সুবিধা থাকিলেই অরণ্য সম্পদের অর্থ নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

মৃত্তিকা

হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া সূর্যের তাপ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত প্রভৃতির ক্রিয়ায় ভূ-ত্বকের শিলা ক্ষয়ীভূত হওয়ার ফলে **মৃত্তিকার** সৃষ্টি হইয়াছে। শিলায় শিলায় ঘর্ষণের ফলে কঠিন শিলাস্তর ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে এবং এই ক্রিয়া এখনও চলিতেছে। মৃত্তিকা ব্যতীত কৃষিকার্য সম্ভব নহে। শিলাচূর্ণ ই মৃত্তিকার উপাদান। বৃক্ষলতাদি নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার উপরেই জন্মে। বালি, কাদা, চুন, মৃত জীবজন্তুর হাড় ও গাছপালার গলিত অংশ বা জৈব-পদার্থ (হিউমাস) শিলাচূর্ণের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। বিভিন্ন উপাদানে গঠিত মৃত্তিকায় বিভিন্ন প্রকার শস্য
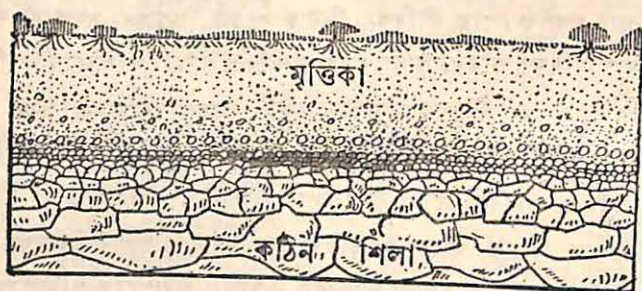
মৃত্তিকা

উৎপাদনের উপযোগী উর্বরতা-শক্তি থাকে। আবার অক্সিজেন, কার্বলিক-এ্যাসিড গ্যাস, ধাতব লবণ প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু শিলাচূর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। রাসায়নিক ভিত্তিতে মৃত্তিকাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) **পেডল্ফার** মৃত্তিকা (Pedalfar)—এই মৃত্তিকায় লৌহ ও এ্যালুমিনিয়ম-এর পরিমাণ বেশী। ইহা ধূসর-বাদামী বর্ণের অথবা রক্ত ও পীত বর্ণের হইয়া থাকে। সাধারণত বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহাতে অম্লত্ব বেশী, তাই অনুর্বর।

(খ) **পেডোক্যাল** মৃত্তিকা (Pedocal)—এই মৃত্তিকায় চুনের ভাগ বেশী এবং ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। সাধারণত অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ—মৃত্তিকা প্রধানত দুই প্রকারের, (১) অবশিষ্ট ও (২) অপসৃত মৃত্তিকা। কোন কোন স্থানের কঠিন শিলা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকার

কণাগুলি তৈয়ারি হইবার পর সেই স্থানেই নীচের শিলাস্তরের উপরে আবরণ সৃষ্টি করে। এইরূপ আবরণকে **অবশিষ্ট** মৃত্তিকা (Residual Soil) বলে। ভিন্ন ভিন্ন শিলাস্তর হইতে ভিন্ন ভিন্ন মাটির সৃষ্টি হয়। যেমন, চুনাপাথরের স্তর ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া চুনামাটি, বেলেপাথর হইতে বেলেমাটি ইত্যাদি নানাপ্রকার মাটির সৃষ্টি হইয়াছে। অবশিষ্ট মৃত্তিকার নীচে কঠিন শিলার বিভিন্ন অবস্থার স্তর দেখা যায়, তাহাকে **অন্তর্ভূমি** (Sub-Soil) বলে। ছোটনাগপুরে এই রকম স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে শিলাচূর্ণ নদীস্রোত, বৃষ্টির জল, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি দ্বারা উৎপত্তি স্থান হইতে অপসারিত হইয়া অন্যস্থানে সঞ্চিত হয়। তাহাকে **অপসৃত** মৃত্তিকা (Transported Soil) বলে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার শিলাচূর্ণ ও উপাদানে এই শ্রেণীর মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহা খুব উর্বর হয়।

ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। যথা—

(১) **পার্বত অঞ্চলের মৃত্তিকা**—পর্বত গাত্রে হিমবাহ দ্বারা আনীত **কাঁকর মিশ্রিত** মৃত্তিকা এবং নিম্নাংশে হিমবাহ গলিয়া গেলে **প্রস্তর মিশ্রিত কাদা মাটি** (Boulder Clay) দেখা যায়। হিমালয়ের পার্বত অঞ্চলে **পডসল** (Podsol) জাতীয় মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকায় গাছপালার গলিত পদার্থ অধিক থাকায় ইহার অম্লত্ব বেশী। ইহার উর্বরতা-শক্তি কম বলিয়া ইহা চাষের পক্ষে অনুপযোগী। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্য অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মাটির রং ধূসর ও বাদামী। পূর্ব হিমালয়ের **গ্রে ব্রাউন** (Grey Brown) মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত উর্বর। এখানে চা, কমলালেবু, আলু প্রভৃতি ভাল উৎপন্ন হয়।

(২) **সমভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা**—উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ সমভূমি পলি-মাটি দ্বারা গঠিত। গাঙ্গেয় সমভূমি, আসাম উপত্যকা, ব-দ্বীপ অঞ্চল প্রভৃতি নদী বাহিত পলিমৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ও ইহাদের উপনদী-সমুহ প্রচুর পলি বহন করিয়া আনে। নদীর জলস্রোতের দ্বারা প্রতি বৎসর নূতন পলি সঞ্চিত হয়, ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। **প্রাচীন পলির** বা **ভাঙ্গরের** উর্বরতা কম। **নূতন পলির** বা **খাদারের** উর্বরতা বেশী। ভাঙ্গর মৃত্তিকায় চুনজাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। ইহা কঙ্করময় ও ঈষৎ হরিদ্রাভ। ইহা সাধারণত পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও উত্তর বিহারে দেখা যায়। এই মৃত্তিকায় গম, ভুট্টা, আলু প্রভৃতি বেশী উৎপন্ন হয়। নদীর

নিকটবর্ত্তী অঞ্চলগুলি খাদার মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। ইহা উর্বর ও কৃষির উপযোগী। এই পলিমৃত্তিকায় ধান, গম, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হয়। পাঞ্জাব ও রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলের অনেক স্থানে মৃত্তিকায় লবণের ভাগ বেশী দেখা যায়। এইরূপ মাটিকে **রে** বা **কাল্লার** (Reh or Kallar) বলে।
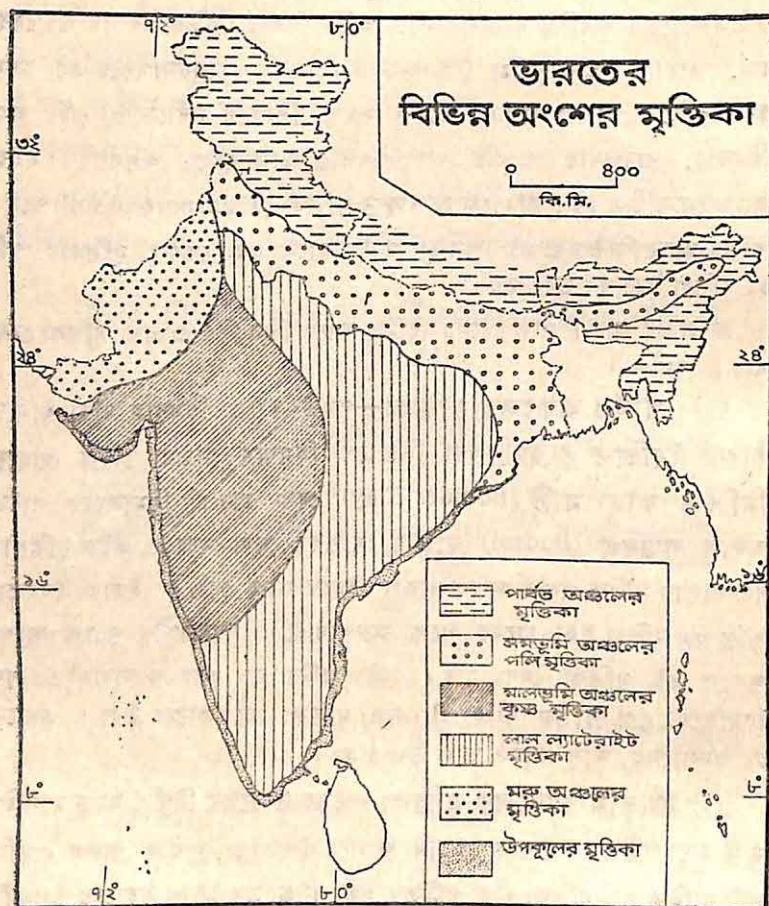
গঠন হিসাবে **পলিমাটিকে** তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) **বেলেমাটি** (Sandy Soil) বা বালুকা-প্রধান পলিমাটি। পাঞ্জাবে ও গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর-পশ্চিমে এইরকম মাটি বেশী দেখা যায়। ইহার জল-ধারণের ক্ষমতা কম। বেলেমাটিতে আলুর চাষ ভাল হয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীর চরের মাটি প্রায় এইরকম। এই মাটিতে পটল, শশা, তরমুজ প্রভৃতি ফসল ভাল হয়।

(খ) **এঁটেল মাটি** (Clayey Soil)—যে পলিমাটিতে শতকরা ৭০ ভাগ কাদা এবং বাকী অংশে বালি ও জল থাকে, তাহাকে এঁটেল মাটি বলে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলে এই মৃত্তিকা দেখা যায়। এই কাদা-মিশ্রিত মৃত্তিকা খুব উর্বর। এই মৃত্তিকায় ধান ও পাটের চাষ ভাল হয়।

(গ) **দোআঁশ মাটি** (Loamy Soil)—নূতন পলিমাটির যে অংশ কাদা, বালি, হিউমাস সংমিশ্রণে গঠিত হয়, তাহাকে দোআঁশ মাটি বলে। ইহা খুব উর্বর। পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে এইরূপ মৃত্তিকা দেখা যায়। ইহা কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী। এই মাটিতে ধান, গম, যব, ভুট্টা, সরিষা, তামাক, ইক্ষু ইত্যাদি ফসলের চাষ ভাল হয়।

(৩) **মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকা**—দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নানারকম প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত। এই সকল শিলা দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া দ্বারা ক্ষয়ীভূত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে। মালভূমি অঞ্চলের মৃত্তিকাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(ক) **রেগুর** বা **কৃষ্ণমৃত্তিকা** (Regur or Black Cotton Soil)—লাভা গঠিত বেসণ্ট শিলা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই মাটির রং কালো। ইহা উর্বর এবং এই মাটিতে কার্পাস অধিক জন্মে। তাই ইহাকে **কৃষ্ণ কার্পাস মৃত্তিকা** বলা হয়। কাঠিয়াবাড় উপদ্বীপে ও গুজরাটের দক্ষিণাংশে, সমগ্র মহারাষ্ট্রে, মধ্য প্রদেশের মধ্য ও পশ্চিমভাগে, কর্ণাটকের উত্তরাংশে, অন্ধ্র প্রদেশের দক্ষিণাংশে এবং তামিলনাড়ুর মধ্য ও দক্ষিণাংশে কৃষ্ণ মৃত্তিকা দেখা যায়। কৃষ্ণ মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে কাদা মিশ্রিত থাকায় ইহার জলধারণের ক্ষমতা খুব বেশী। এই মৃত্তিকায় তুলা, গম, যব, তৈলবীজ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(খ) **লাল মৃত্তিকা** (Red Soil)—ইহা এক প্রকার দোআঁশ মাটি। ইহার সহিত লৌহ মিশ্রিত থাকায় ইহার বর্ণ লাল। তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের অনেক স্থানে, অন্ধ্রপ্রদেশের উত্তর-পূর্বে, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরের পূর্বাংশে, উড়িষ্যায়, মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ডে এবং কেরালায় লাল মাটি দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশে, এবং মেঘালয়ের পার্বত অঞ্চলে লাল দোআঁশ মৃত্তিকা দেখা যায়। জলসেচের সাহায্যে এই প্রকার মাটিতে ধান, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ হয়।

(গ) **ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা** (Laterite Soil)—এই মৃত্তিকায় লৌহ ও এ্যালুমিনিয়মের অংশ অধিক থাকে। লৌহের মিশ্রণেই ইহার বর্ণ হয় লাল। ইহা দেখিতে পোড়া ইটের ন্যায়। এই মাটির জল ধারণ করিবার ক্ষমতা কম, তাই ইহা অনুর্বর। ইহা কৃষিকার্যের পক্ষে উপযোগী নহে। মালভূমির দক্ষিণাংশে, নীলগিরি অঞ্চলে, মালাবার উপকূলে, পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতে, মধ্যপ্রদেশে ও রাজমহল পাহাড়ে এই মৃত্তিকা দেখা যায়।

(৪) **উপকূলভাগের ও মরু অঞ্চলের মৃত্তিকা**—উপকূলের মৃত্তিকা বালুকাময় ও লবণাক্ত। এই মৃত্তিকায় নারিকেল, সুপারি ও কাজুবাদাম ভাল জন্মে। রাজস্থানের শুষ্ক অঞ্চলের ও থর মরুভূমির মৃত্তিকায় বালি ও লবণ মিশ্রিত আছে। ইহাতে জৈব পদার্থ (হিউমাস) কম; উর্বরতাও ইহার বেশী নহে। ইহাকে **সিয়ারোজেম** (Sierozem) মৃত্তিকা বলে। ইহাতে বাবলা, ফণিমনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ ও খেজুর গাছ ভাল জন্মে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃষি

প্রথম পাঠ

জলসেচ ব্যবস্থা

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকার্যের একটি প্রধান উপাদান জল। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক গঠনের জন্য এই বৃষ্টির পরিমাণ ভারতের ন্যায় বিশাল দেশের সর্বত্র সমান নহে। এই দেশের কোথাও অতিবৃষ্টি, কোথাও স্বল্পবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি। সুতরাং বৃষ্টিপাতের সময় ও পরিমাণ অনিশ্চিত হওয়ায় দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে কৃষিকার্যের জন্য জলসেচ ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। ভারতে মোট কৃষি-জমি ১৬·৯০ কোটি হেক্টেয়ার*। চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রায় ৪·৪৭ কোটি হেক্টেয়ার কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। বড় ও মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হইলে ৮·১৭ কোটি হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ সম্ভব হইবে।

---

* ১ হেক্টেয়ার = প্রায় ২·৫ একর।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৫১-'৫৬) হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৩৪টি সেচ-প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩১৮টি ফলদান করিতেছে। বৃষ্টি, তুষার, পার্বত নির্ঝর (জলপ্রপাত) প্রভৃতি হইতে বৎসরে যত জল পাওয়া যায় তাহার ব্যবহার-যোগ্য অংশের মোট ৩৬% কৃষিকল্যাণ ও অপরাপর কাজে লাগান সম্ভব হইয়াছে।
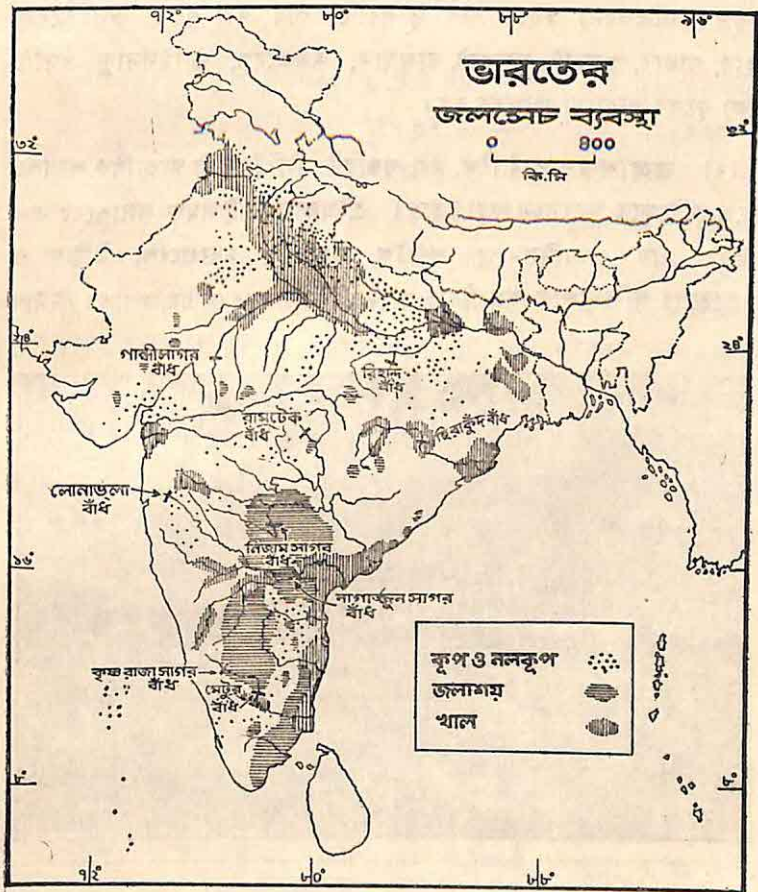
ভারতের জলসেচ পদ্ধতি—ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তিনটি প্রণালীতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। যথা—(১) কূপ ও নলকূপ, (২) জলাশয় এবং (৩) খাল।

(১) **কূপ ও নলকূপ**—প্রাচীনকাল হইতে গভীর ইন্দারা, কাঁচা কূপ ও বাঁধান কূপ হইতে জল তুলিয়া শস্যক্ষেত্রে সেচন করা হইতেছে। গরু, উট প্রভৃতি পশুর সাহায্যে এবং পারস্য চাকার (Persian Wheel) সাহায্যে বহু কূপ হইতে জল তুলিয়া সেচ-কার্য চলিতেছে। কিন্তু কূপ হইতে জলতোলা পরিশ্রম সাপেক্ষ এবং কূপের জলদ্বারা বহুদূর বিস্তৃত ভূমিতে জলসেচ করা কঠিন। তাই বর্তমানে অনেক স্থানে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে কূপ ও নলকূপ (Tubewell) হইতে জল তুলিয়া সেচকার্য করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে কূপের সাহায্যে জলসেচ হয়।

(২) **জলাশয়**—পূর্বে বিল, হ্রদ, পুষ্করিণী, দীঘি প্রভৃতি স্বাভাবিক জলাশয় হইতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হইত। গ্রীষ্মকালে এই সমস্ত জলাশয়ের জল শুকাইয়া যায়। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে অল্পবৃষ্টিযুক্ত স্থানের নিম্নভূমিতে কৃত্রিম জলাশয় নির্মাণ
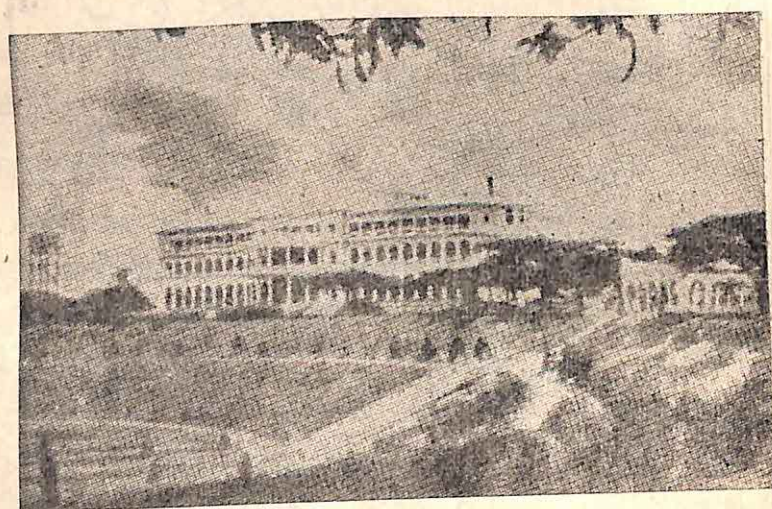
কৃষ্ণ রাজাসাগর

করিয়া বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় এবং প্রয়োজনের সময় ঐ জলাশয় হইতে শস্যক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়। ইহা ব্যতীত, নদীতে বাঁধ দিয়া জলাশয় (Reservoir) সৃষ্টি করিয়া তাহা হইতেও জলসেচন করা হয়। হিমাচল প্রদেশ ও

পাঞ্জাবের সীমায় শতদ্রু নদীতে বাঁধ দিয়া **গোবিন্দসাগর,** চম্বল নদীতে বাঁধের দ্বারা রাজস্থানের **রাণাপ্রতাপসাগর** ও মধ্যপ্রদেশের **গান্ধীসাগর,** কর্ণাটকের কাবেরী নদীর বাঁধের দ্বারা **কৃষ্ণরাজাসাগর,** অন্ধ্রের গোদাবরী নদীর বাঁধের দ্বারা **রামপদসাগর** এবং ইহার উপনদী মঞ্জীরার উপর বাঁধের দ্বারা **নিজামসাগর,** কৃষ্ণানদীতে বাঁধ দিয়া **নাগার্জুন সাগর** প্রভৃতি জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। জলাশয় দ্বারা মোট জমির শতকরা ১৮ ভাগ জমিতে সেচকার্য হয়।

(৩) **খাল**—বর্তমানে ভারতে বেশীর ভাগ জমিতে নদী হইতে খালের সাহায্যে জলসেচ করা হইতেছে। খাল দুই প্রকারের—**স্থায়ী** বা **নিত্যবহা খাল** (Perennial Canal) ও **প্লাবন খাল** (Inundation Canal)। উচ্চ পর্বতের তুষারগলা জল হইতে নদী উৎপন্ন হইয়া পার্বতভূমি হইতে যেখানে সমভূমিতে নামিয়াছে সেখান হইতে যদি খাল কাটা হয়, তাহা হইলে সারাবৎসরই খালে জল থাকে। এইরূপ খালকে স্থায়ী বা নিত্যবহা খাল বলে। ইহা ছাড়া, বর্ষাকালে বৃষ্টি ও বন্যার জলে পুষ্ট নদী হইতেও খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ খালে বর্ষাকালেই প্রচুর জল থাকে। ইহাকে প্লাবন খাল বলা হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে প্লাবন খালে জল থাকে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার কৌশলে অনেক প্লাবন খালকেও স্থায়ী খালে পরিণত করা হইতেছে। বর্তমানে এই সকল খালে জল চলাচলের নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানে স্থানে দরজার (Sluice Gate) ব্যবস্থা আছে।

(ক) কয়েকটি পুরাতন সেচ-খাল

মুসলমান সম্রাট্‌দিগের আমলে যে কয়েকটি বড় খাল কাটা হইয়াছিল, তন্মধ্যে **পূর্ব** ও **পশ্চিম যমুনা খাল** বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে ইংরাজ আমলে খালগুলির কিছু সংস্কার হয়। বর্তমানেও পুরাতন সেচ ব্যবস্থার অনেক স্থানে সংস্কার হইতেছে।

পাঞ্জাব ও হরিয়ানা খাল—(১) **পশ্চিম যমুনা খাল** হইতে পাতিয়ালা, ঝিন্দ্‌, রোহ্‌টক ও হিসার অঞ্চলের ভূমিতে জলসেচ করা হইতেছে।

(২) **সিরহিন্দ খাল**—শতদ্রু নদীর তীরস্থ **রূপর** নামক স্থান হইতে এই খাল কাটা হইয়াছে। এই খালের সাহায্যে হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা,

কাপুরথালা, ফিরোজপুর, হিসার ও নাভা নামক জেলাগুলির ৫·১ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ হয়।

(৩) **উচ্চ বারি-দোয়াব খাল** (Upper Bari Doab Canal)—দুইটি নদীর মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিকে 'দোয়াব' বলে। ইরাবতী ও বিপাশা নদীর দোয়াব অঞ্চলে ইরাবতী নদী হইতে উচ্চ বারি-দোয়াব খাল কাটা হইয়াছে। ইহাতে ৩·৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ হইতেছে।

উত্তর প্রদেশের খাল—(১) **পূর্ব যমুনা খালের** সাহায্যে সাহারাণপুর, মুজঃফরনগর ও মীরাট জেলায় জলসেচ হয়।

(২) **আগ্রা খাল**—ইহা যমুনা নদী হইতে কাটা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মথুরা ও আগ্রা জেলায় এবং দিল্লীর কিয়দংশে ১৭·৮৮ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ করা হয়। মূল খালের দৈর্ঘ্য ২২৪ কি-মি.।

(৩) **উচ্চ গঙ্গা খাল**—হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা নদী হইতে উচ্চ গঙ্গা খাল কাটা হইয়াছে। এই খাল হরিদ্বার হইতে আলিগড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় জল সরবরাহ করিয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া একটি এটাওয়া ও অপরটি কানপুরে শেষ হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচন করা হয়।

(৪) **নিম্ন গঙ্গা খাল**—বুলন্দশহর জেলার নারোরা হইতে এই খালটি আসিয়া উচ্চ গঙ্গা খালের নিম্নাংশের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালের সাহায্যে আলিগড়, এটাওয়া, ফরাক্কাবাদ, ফতেগড়, কানপুর, ফতেপুর প্রভৃতি জেলায় প্রায় ৪·৮ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ হয়।

(৫) **সর্দা খাল**—নেপাল সীমান্তে ঘর্ঘরা নদীর উপনদী সর্দা নদীর উচ্চাংশে অবস্থিত বনবাসা নামক স্থান হইতে সর্দা খাল কাটা হইয়াছে। এই খালের সাহায্যে খেরী, হারদোই, সাহজাহানপুর, বেরিলী, লক্ষ্ণৌ সুলতানপুর, প্রতাপগড়, এলাহাবাদ প্রভৃতি জেলায় জলসেচ হয়।

(৬) **বেতোয়া খাল**—ইহার সাহায্যে জলাওন, বুন্দেলখণ্ডের হামিরপুর ও ঝাঁসী জেলায় জলসেচ হয়। ঝাঁসী হইতে ২৭·২ কি-মি. দূরে বেতোয়া নদীর উপরে বাঁধ নির্মিত হইয়াছে।

বিহারের খাল—বিহারের **শোণ নদ** হইতে খাল কাটিয়া সাহাবাদ, গয়া ও পাটনা জেলায় সেচের জল সরবরাহ করা হয়। খাল ব্যবস্থার সংস্কার সম্পূর্ণ

হইলে ৪ লক্ষ হেক্টেয়ার পরিমিত ভূমিতে জলসেচ করা চলিবে এবং দ্বিগুণ ফসল উৎপাদিত হইবে। ডিহ্‌রি এ্যানিকটের মূল পশ্চিমখাল ৩৫·২ কি-মি. দীর্ঘ এবং মূল দক্ষিণ খাল (পূর্বদিকে) ১২·৮ কি-মি. দীর্ঘ। এ্যানিকট বাঁধটি ৩,৮০০ মিটার লম্বা ও ৪৬·৫ মিটার চওড়া। ইহা দ্বারা ২·৯ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে চাষের সুবিধা হয়।

উড়িষ্যার খাল—মহানদী, বিরূপা ও কাঠজুড়ির উপর একটি বাঁধ দিয়া সেগুলি হইতে চারিটি খাল কাটিয়া বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উড়িষ্যায় এই খালগুলির সাহায্যে ৩·৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের সুবিধা হয়। মধ্যপ্রদেশে মহানদী সেচপরিকল্পনারই এক পৃথক বিভাগ ৮৪ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ দ্বারা চাষের সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাল—পশ্চিমবঙ্গের শুষ্ক অঞ্চলে চারিটি পুরাতন সেচ খাল আছে। যথা—(১) **মেদিনীপুর** খাল, (২) **ইডেন** খাল, (৩) **বক্রেশ্বর** খাল ও (৪) **দামোদর** খাল। এতদ্ব্যতীত, বীরভূম জেলায় **ময়ূরাক্ষী** নদীতে বাঁধ দিয়া এবং বর্ধমান জেলার **দামোদর** নদে বাঁধ দিয়া বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। **তিস্তা, ফরাক্কাবাঁধ** ও **কংসাবতী** প্রভৃতি পরিকল্পনার কার্যগুলি শেষ হইলে পশ্চিমবঙ্গে আরও কয়েক হাজার হেক্টেয়ার শুষ্ক জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাইবে।

মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু ও **অন্ধ্রপ্রদেশ**—গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি নদীতে বাঁধের সাহায্যে সেচকার্য চলিতেছে। কৃষ্ণা নদী ও ইহার উপনদী তুঙ্গভদ্রা, ভীমা, ঘাটপ্রভা ও মালপ্রভা হইতে জল লইয়া খালযোগে মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে জলসেচ করা হয়। **গোদাবরী-অববাহিকা সেচ-প্রণালী** দ্বারা রাজমুন্দ্রীর অনতিদূরে স্থাপিত দৌলেশ্বরম্ এ্যানিকট হইতে তিনটি খালে জল প্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা আছে। মূল খালের দৈর্ঘ্য ৮৪৫ কি-মি.। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীদ্বয় একটি খাল দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশ ২৬,০০০ হেক্টেয়ার জমিতে সেচদান করিতেছে। ইহার সহিত অন্ধ্র প্রদেশের **প্রকাশম্** বাঁধ ৪৪ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে জল সরবরাহ করিতেছে। কর্ণাটকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে কাবেরী নদীতে বারোটি এ্যানিকটের সাহায্যে সেচ-ব্যবস্থা আছে।

তন্মধ্যে **মদতকাট্টে** খাল সর্বপ্রধান। থাঞ্জাভুরে (তাঞ্জোরে) কাবেরী নদীর **কোলেরুন বাঁধ** অতি প্রাচীন। **পেন্নার** নদীর **নেলোর বাঁধ** ও এ্যানিকটের সাহায্যে অন্ধ্রপ্রদেশে জলসেচ করা হয়। ইহাতে ৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ চলিতেছে। **কুড্ডাপা-কুর্ণুল** খাল দ্বারা তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নার নদীদ্বয়কে যুক্ত করা হইয়াছে।

কেরালা রাজ্যের প্রধান নদী **পেরিয়ার**। সেচের সুবিধার জন্য ইহার স্রোত যাহাতে ইহার স্বাভাবিক গন্তব্যস্থান আরব সাগরের পরিবর্তে বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই নদীর জল সুড়ঙ্গপথে কার্ডামম পাহাড়ের মধ্য দিয়া পূর্বদিকে লইয়া গিয়া ভাইগাই নদীতে প্রবাহিত করা হইয়াছে। **পেরিয়ার-ভাইগাই** নদীর খালের সাহায্যে মাদুরাই জেলার কৃষি ভূমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পালঘাট জেলার **মালামপুজ্জা** নদীর উপর বাঁধ দিয়া ৩৮·৫ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে সেচ সম্পন্ন হইতেছে।

(খ) নুতন সেচব্যবস্থা ও বহু উদ্দেশ্যমূলক নদী-পরিকল্পনা

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ হইতে পর্যায়িত পঞ্চবার্ষিকী নদী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

এই নদীপরিকল্পনা দ্বারা **বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, ভূমি সংরক্ষণ,** উন্নত **জলসেচ** ব্যবস্থা, **দুর্ভিক্ষ নিবারণ,** খালে **নৌ চলাচল, মৎস্য চাষ** ইত্যাদি বিবিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে বলিয়া এইরূপ পরিকল্পনাকে **বহু উদ্দেশ্য মূলক নদী পরিকল্পনা** (Multipurpose River Valley Project) বলা হয়। পূর্বেকার বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থায় মোট ২·২৭ কোটি হেক্টেয়ার জমিতে সেচকার্য সম্পন্ন হইত। অধিকাংশ নূতন সেচ-পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে ভারতে বড় ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা হইতে ৪·৫৩ কোটি হেক্টেয়ার এবং ক্ষুদ্রকায় সেচব্যবস্থা হইতে ৩·৬৪ কোটি হেক্টেয়ার জমিতে সেচ সম্ভব হইবে।

নিম্নে কয়েকটি প্রধান নদী-পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (The Damodar Valley Project)—পূর্বে প্রতিবৎসর দামোদর নদের ভয়াবহ বন্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ক্ষতি হইত। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার **দামোদরভ্যালি**

কর্পোরেশন (D.V.C.) নামক এক সংস্থা গঠন করিয়া তাহার উপর এই বহুমুখী নদী পরিকল্পনানুযায়ী কাজের ভার অর্পণ করেন।
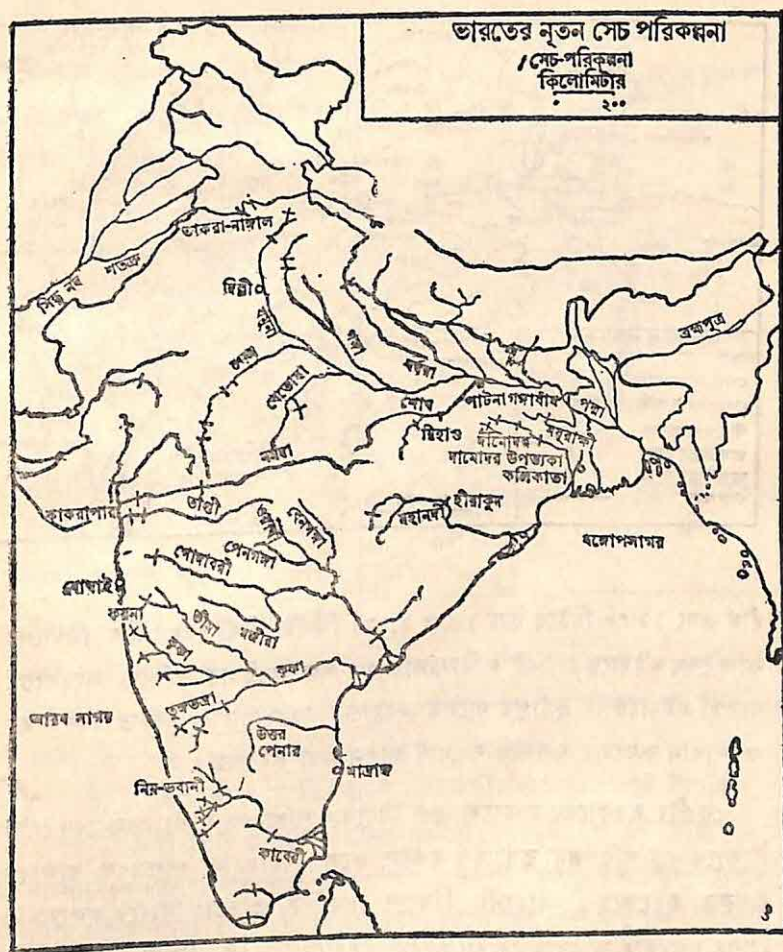
এই পরিকল্পনানুসারে দামোদরের উপনদী বরাকরের উপরে **তিলাইয়া, বেলপাহাড়ী ও মাইথন,** বোকারোর উপরে **বোকারো** বাঁধ এবং কোনারের উপরে তিনটি বাঁধ **কোনার** (১, ২, ৩), দামোদরের উপরে **আয়ার, বার্মো ও পাঞ্চেৎ হিল**—এই তিনটি বাঁধ, মোট দশটি বাঁধ এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে একটি **ব্যারেজ** বা সেচবাঁধ নির্মান করা

হইয়াছে। বোকারো ইস্পাত কারখানায় জল সরবরাহের সুবিধার জন্য সম্প্রতি **তেনুঘাটে** একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। দুর্গাপুর ব্যারেজ (৬৯২ মিটার
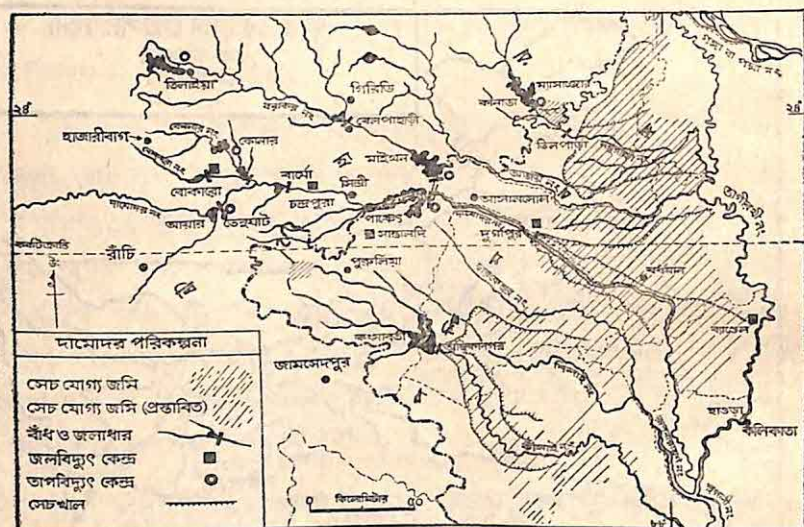
দীর্ঘ এবং ১১·৫৮ মিটার উচ্চ) এবং ২,৪৯৫ কি-মি. দীর্ঘ সেচ খাল নির্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ৩·৭ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। দুর্গাপুর খালের সাহায্যে কলিকাতার সহিত রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলের জলপথে সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে এবং বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার ফলে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যদ্বয় উপকৃত হইতেছে। বাঁধগুলি বিহারে অবস্থিত, সুতরাং বিহারে জলসেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। দুর্গাপুরের সেচ-বাঁধের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-জমিতে জল-সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার ফলে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(২) ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা (The Bhakra-Nangal Project)—ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী পরিকল্পনা। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মিলিত

প্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনানুসারে পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমারেখায় **ভাকৃরা** নামক স্থানে শতদ্রু নদীর উপর ২২৬ মি. উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৫১৮ মি., প্রস্থ ৩০৭ মি.। ভাকৃরা বাঁধের দক্ষিণে শতদ্রু নদীর উপর **নাঙ্গাল** নামক স্থানে ২৯ মি. উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৩১৪ মি., প্রস্থ ১২২ মি.।

ভাকৃরা বাঁধের পশ্চাতে ১৬৫ বর্গ কি-মি. আয়তনের একটি জয়াশয় নির্মিত হইয়াছে। ইহার নাম **গোবিন্দসাগর।** জল-সেচের জন্য ইহার জল ব্যবহার করা হয়। নাঙ্গাল বাঁধের পিছন হইতে একটি খাল কাটা হইয়াছে। **নাঙ্গাল খালের** দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাকৃরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনায় খালের সাহায্যে রাজস্থানের বিকানীর পর্যন্ত ১৪·৬ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ চলিতেছে।
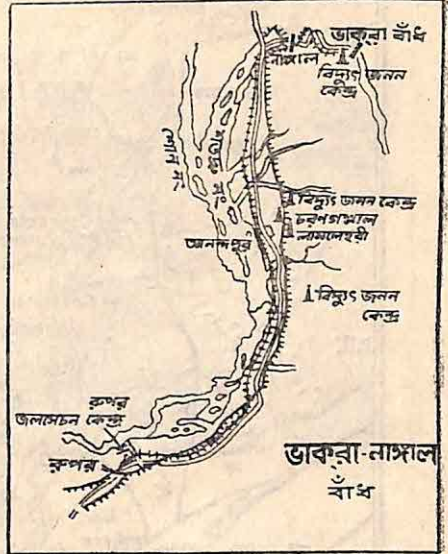
(৩) গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা (The Ganga Barrage Project)— পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। মূল স্রোতটি **পদ্মা** নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং অপর স্রোতটি **ভাগীরথী** এবং **হুগলী** নামে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৩-'৬৪ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনানুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকট **তিলডাঙ্গা** নামক স্থানে গঙ্গার উপর একটি বাঁধ (৭½ মি. উচ্চ এবং ২,২১০ মি. দীর্ঘ) নির্মিত হইয়াছে। ইহারই নাম **ফরাক্কা বাঁধ।** এই বাঁধের পশ্চাৎভাগ হইতে ৩৯ কি-মি, দীর্ঘ একটি খাল কাটিয়া জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথী নদীর

সহিত যুক্ত করার কাজও শেষ হইয়াছে, ফলে গঙ্গার স্রোত ভাগীরথী নদীতে ফিরিয়া আসিলে ভাগীরথী-হুগলী নদীতে জলবৃদ্ধি হইবে। হুগলী নদীর মোহানায় স্রোতের জন্য পলি জমিতে পারিবে না। কলিকাতা বন্দরের বিশেষ
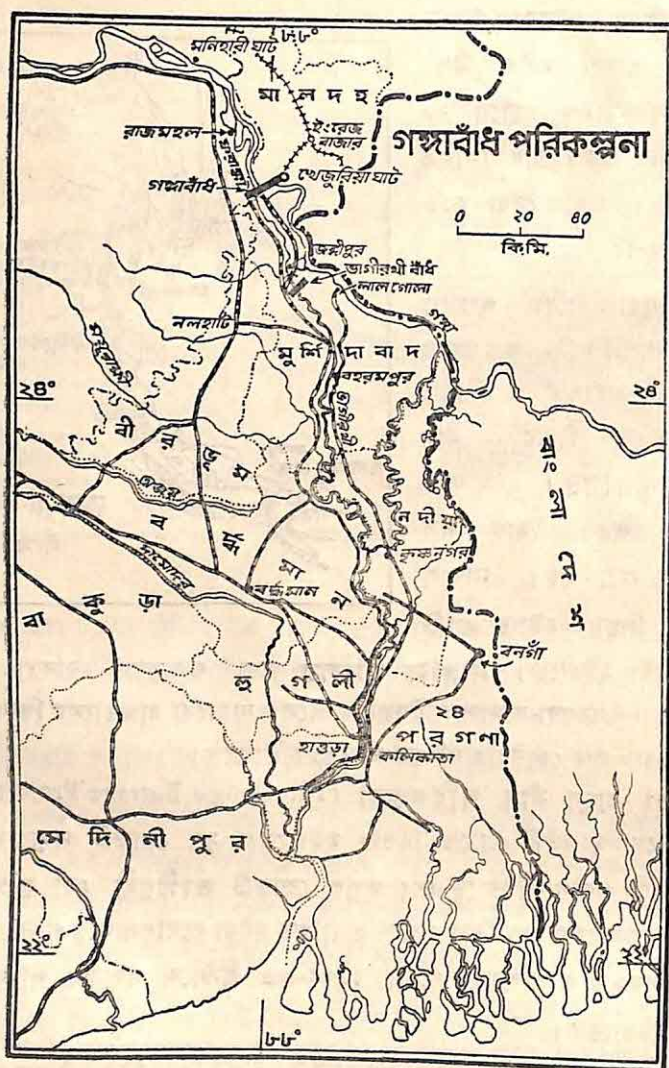
উন্নতি সাধিত হইবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী বাঁধের উপর দিয়া রেলপথে ও স্থলপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গের সহিত কলিকাতার যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। এই বাঁধের ফলে পশ্চিমবঙ্গে দক্ষিণবাহিনী নদীগুলি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইবে।

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় জলসেচ ও মৎস্য চাষের সুবিধা হইবে।

(৪) **মহানদী পরিকল্পনা**—(The Mahanadi Project)—মহানদী উড়িষ্যার বৃহত্তম নদী। মহানদী পরিকল্পনানুসারে এই নদীর উপর **হীরাকুদ, টিকারপাড়া ও নারাজ**—এই তিন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলসেচের

হীরাকুদ বাঁধের একাংশ
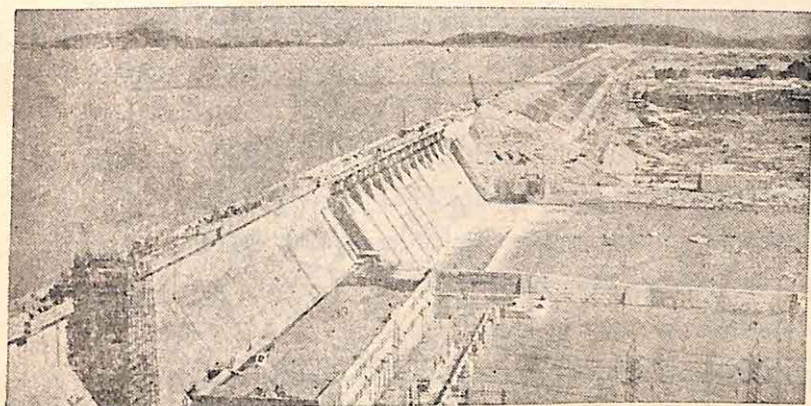
ব্যবস্থা, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে। হীরাকুদ (৪,৮০১ মি. দীর্ঘ) বাঁধের কাজ শেষ হইয়াছে। ইহা বর্তমানে পৃথিবীর দীর্ঘতম জলসেচ বাঁধ। ইহা হইতে খালের সাহায্যে ২·৫৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে সেচকার্য চলিতেছে।

(৫) **কুশীপরিকল্পনা** (The Kosi Project)—কুশী গঙ্গার একটি উপনদী, হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া নেপাল ও বিহারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। ভারত ও নেপাল সরকারের মধ্যে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী পরিকল্পনাটি গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কুশী নদীর উপর বিহার-নেপাল সীমান্তে **হনুমাননগরে** একটি ব্যারেজ বা সেচ বাঁধ নির্মিত হইতেছে। ব্যারেজের দুইধারে পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি খাল কাটা হইয়াছে। পশ্চিমদিকের খালের সাহায্যে নেপালের হনুমাননগর, বিরাট নগর নামক অঞ্চলগুলিতে এবং পূর্বদিকের খালের সাহায্যে উত্তর বিহারের ভাগলপুর, মুজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা ও পূর্ণিয়া জেলায় জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৬) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (The Mor Project)—এই পরিকল্পনা অনুসারে বিহারের মাসাঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ৬৪০ মি. দীর্ঘ এবং ৪৭·২৪ মি. উচ্চ একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। কানাডা সরকারের সাহায্যে এই বাঁধ নির্মিত হওয়ায় উহাকে **কানাডা বাঁধ** বলা হয়। ইহাতে বিহারের দুমকা জেলায় জলসেচন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্যা নিবারণ প্রভৃতির সুবিধা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার সিউড়ির নিকট **তিলপাড়া**

ব্যারেজ নির্মিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই নামে ইহার চারিটি উপনদীতেও চারিটি ক্ষুদ্র ব্যারেজ তৈয়ারি হইয়াছে। তিলপাড়া ব্যারেজ হইতে যে খাল কাটা হইয়াছে, উহার সাহায্যে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় জলসেচ করা হইতেছে। ময়ূরাক্ষী বাঁধ পরিকল্পনায় বিহারের সাঁওতাল পরগনা, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ২·৬৩ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ হইতেছে।

(৭) **রিহান্দ পরিকল্পনা** (The Rihand Project)—উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় **পিপরী** নামক স্থানে শোণ নদের উপনদী রিহান্দের উপর ৯০০ মিটারের অধিক দীর্ঘ এবং ৯১ মিটার উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। ইহা হইতে খালের সাহায্যে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহারে ৭·৭ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ হইতেছে।

(৮) **গণ্ডক পরিকল্পনা** (The Gandak Project)—ভারত ও নেপাল সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে গণ্ডক নদীর উপর বাল্মীকি নগরের নিকট ৭৪০ মি. দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে; বিহার ও উত্তর প্রদেশ এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হইবে।

(৯) **চম্বল পরিকল্পনা** (The Chambal Project)—মধ্যপ্রদেশের যমুনার উপনদী চম্বল নদীর উপর **চম্বল, বর্ণা** ও **তাওয়া** এই তিনটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। বর্ণা ও তাওয়া প্রকল্পে যথাক্রমে ৬৬ হাজার ও ৩·৩২ লক্ষ হেক্টেয়ার জমি সেচ-সমৃদ্ধ হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে চম্বলের উপর বাঁধ দিয়া **গান্ধীসাগর** ও **রাণাপ্রতাপ সাগর** নামে দুইটি প্রকাণ্ড জলাশয় তৈয়ারি করিয়া মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে জলসেচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্পূর্ণ কাজ শেষ হইলে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে ৫·৬৬ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে।

(১০) **নাগার্জুনসাগর বাঁধ পরিকল্পনা** (The Nagarjunasagar Project)—অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া **নাগার্জুনসাগর** নামক বৃহৎ জলাশয়ের সৃষ্টি করা হইয়াছে। নাগার্জুনসাগর পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ৮·৩ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচন হইবে।

(১১) **তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা** (The Tungabhadra Project)—অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক রাজ্য সরকারের মিলিত প্রচেষ্টায় কৃষ্ণার উপনদী তুঙ্গভদ্রার উপর কর্ণাটক রাজ্যের হসপেটের নিকটে মালাপুরম নামক স্থানে ২,৪৪১ মিটার দীর্ঘ এবং ৪৯·৩৯ মিটার উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। বাঁধটির দুইদিকে খাল কাটিয়া অন্ধ্র ও কর্ণাটক রাজ্যে ৩·৩৫ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ হইতেছে।

(১২) **কাক্রাপারা পরিকল্পনা** (The Kakrapara Project)—গুজরাট রাজ্যে সুরাটে কাক্রাপারার নিকট তাপ্তী নদীর উপর ৬২১ মি. দীর্ঘ ও ১৪ মি.

উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ২·২৮ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। **সেত্রুঞ্জী** (Setrunjee) প্রকল্পে ৩৪·৮ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(১৩) কুণ্ডা পরিকল্পনা (The Kunda Project)—তামিলনাড়ুর নীলগিরি অঞ্চলে ভবানীর (কাবেরী নদীর উপনদী) উপনদী কুণ্ডার উপর **এভালেন্স** ও **এমারেল্ড** নামে দুইটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া প্রায় ১ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কানাডা সরকারের সহায়তায় ইহাদের নির্মাণ কার্য চলিতেছে। ইহা ভিন্ন, তামিলনাড়ু ও কেরালা রাজ্যের মিলিত প্রচেষ্টায় আনামালাই পাহাড়ের ছয়টি নদী এবং সমতলভূমির দুইটি নদীর উপর মোট আটটি বাঁধ দিবার পরিকল্পনা হইতেছে। ইহাকে **পেরাম্বিকুলম্ আলিয়ার পরিকল্পনা** বলা হয়। ইহার কাজ শেষ হইলে ১ লক্ষ হেক্টেয়ার ভূমিতে জলসেচ করা সম্ভব হইবে।

(১৪) রাজস্থান খাল পরিকল্পনা (The Rajasthan Canal Project)—এই পরিকল্পনায় বিপাশা ও শতদ্রুর জল খালের সাহায্যে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা হইয়াছে। পাঞ্জাবে শতদ্রু ও বিপাশার সঙ্গমস্থলের দক্ষিণে শতদ্রু নদীর উপর **হারিকে ব্যারেজ** নির্মিত হইয়াছে। এই ব্যারেজের নিকট ২১৫ কি-মি. দীর্ঘ একটি খাল কাটা হইয়াছে। এই খাল ১৭৮ কি-মি. পাঞ্জাবে ও হরিয়ানায় ৩০ কি-মি. **ফীডার ক্যানাল** হিসাবে রাজস্থানের সুরতগড় পর্যন্ত আনা হইয়াছে। **রাজস্থান সেচ খাল** (৪৬৭ কি-মি. দীর্ঘ) কেবল পশ্চিম রাজস্থানে গঙ্গানগর, বিকানীর, জয়শলমীর প্রভৃতি জেলার মধ্য দিয়া রামগড় পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইবে। ফীডার ক্যানালের কাজ শেষ হইয়াছে। সেচখালের ১৯৫ কি-মি. পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট ২৭২ কি-মি. কাজ সম্পন্ন হইলে ইহা পৃথিবীর দীর্ঘতম খাল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই খালের সাহায্যে রাজস্থানের পশ্চিম অংশে শুষ্ক মরু অঞ্চলের প্রায় ১১·৫ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচ সম্ভবপর হইবে। ফলে মরু অঞ্চল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

(১৫) সঙ্গমেশ্বরম্ ও রামপদসাগর পরিকল্পনা (The Sangameswaram and Rampadasagar Project)—সঙ্গমেশ্বরম্ পরিকল্পনায় কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকট কৃষ্ণার উপর একটি বাঁধ দিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটক রাজ্যে প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে এবং রামপদ সাগর পরিকল্পনায়

গোদাবরী নদীর উপর বাঁধ দিয়া অন্ধ্রপ্রদেশে প্রায় ১১ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইতেছে।

(১৬) ব্রহ্মপুত্র পরিকল্পনা (The Brahmaputra Project)—ভারত ও চীনের সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর বাঁধ দিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে জলসেচের সুবিধা হইবে।

(১৭) কংসাবতী পরিকল্পনা (The Kangsabati Project)—এই পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী নদীর উপর একটি বাঁধ এবং উহার উপনদী কুমারীর উপর অম্বিকানগরে একটি বাঁধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বাঁধের কাজ শেষ হইলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় জলসেচ করিবার সুবিধা হইবে।

দ্বিতীয় পাঠ

কৃষিজাত দ্রব্য*

ভারতের অর্থনীতিতে **কৃষির** স্থান গুরুত্বপূর্ণ। এই দেশের অধিবাসীদিগের প্রায় ৭০ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন অন্ন ও বস্ত্র কৃষির উপর নির্ভর করে। বস্ত্র, পাট, চিনি, চা প্রভৃতি শিল্প কৃষিভিত্তিক। ভারতের **জাতীয়** আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষির দান। এই দেশের মোট কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ১৬·৯০ কোটি হেক্টেয়ার। তন্মধ্যে **দো-ফসলী** জমি ২ কোটি ৬২ লক্ষ হেক্টেয়ার। ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্য সমস্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু বণ্টন না হইলে এই সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন। কৃষির সাফল্য নির্ভর করে **মৃত্তিকার উর্বরতা, জলবায়ু, জলসেচ** ব্যবস্থা, **উচ্চ ফলনশীল বীজ** এবং রাসায়নিক ও জৈব **সারের** ব্যবহার, **কীটনাশক দ্রব্যাদির** ব্যবহার, গভীর ও অগভীর **নলকূপের** ব্যবস্থা, কৃষকদের ঋণদান এবং আধুনিক **কৃষি-যন্ত্রাদির** ব্যবহারের উপর। চতুর্থ যোজনায় (১৯৬৯-'৭৪) মোট ২৪,৮৮২ কোটি টাকা সরকারী বরাদ্দের মধ্যে কৃষির উন্নতিকল্পে ২,৭৪৩ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়।

* পরিসংখ্যানগুলি ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে ভারতের **কৃষি অঞ্চলগুলিকে** প্রধানত চারিভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) **হিমালয়ের পার্বত অঞ্চল** (The Himalayan Zone) যেখানে ১০০ সে-মি.—২৫০ সে-মি. **বৃষ্টিপাত** হয়। গম, ধান, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি এবং নানাবিধ ফল এই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য।

(২) **স্বল্প আদ্র´ অঞ্চল** (Sub-Humid Zone) যেখানে বৃষ্টিপাত মধ্যম, ৭০ সে-মি.—১২৫ সে-মি. ; এই অঞ্চলের অন্তর্গত মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ ও তামিলনাড়ুর মধ্যাংশ। গম, ভুট্টা, ধান, মিলেট, কার্পাস, বাদাম, তৈলবীজ, তামাক, ইক্ষু প্রভৃতি এই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য।

(৩) **বর্ষণসিক্ত অঞ্চল** (Wet Zone) যেখানে **বৃষ্টিপাত** ১২৫ সেন্টিমিটারের অধিক। মালাবার উপকূল, আসাম, মেঘালয়, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ ও পূর্বাংশ, উড়িষ্যা, উত্তর বিহার প্রভৃতি এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ধান, পাট, চা, তৈলবীজ, মিলেট, ইক্ষু, গম, মসলা ইত্যাদি এই অঞ্চলের কৃষিজাত দ্রব্য।

(৪) **শুষ্ক অঞ্চল** (Dry Zone) যেখানে **বৃষ্টিপাত** ৭০ সেন্টিমিটারের কম। পাঞ্জাব, রাজস্থান, কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। গম, মিলেট, তৈলবীজ, কার্পাস, ভুট্টা, বাদাম প্রভৃতি এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য।

ভারতের **কৃষিজাত দ্রব্যগুলিকে** চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(ক) খাদ্যশস্য, (খ) পানীয় ও ভেষজ শস্য, (গ) অন্যান্য ফসল ও (ঘ) ভোগ্য বা বাণিজ্যিক শস্য।

(ক) খাদ্যশস্য (Food Crops)

ধান (Rice)—ধান ভারতের প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা প্রধানত **খারিফ** (বর্ষাকালীন) শস্য। ইহার জন্য প্রচুর **উত্তাপ** (২৪°—২৬° সেন্টিগ্রেড), **বৃষ্টিপাত** (১০০—২০০ সে-মি.) এবং **পলিমাটিযুক্ত সমভূমির** প্রয়োজন। বর্ষার জলে প্লাবিত অঞ্চলে ধানের চাষ ভাল হয়। মৌসুমী বায়ু প্রধান অঞ্চলের আর্দ্র ও উষ্ণ জলবায়ুতে ধান ভাল জন্মে। যেখানে বৃষ্টিপাত অনিয়মিত বা কম সেখানে জলসেচ ব্যতীত ধান উৎপাদন করা যায় না। উচ্চভূমি ও

পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটিয়াও ধানের চাষ হয়। দেরাদুন উপত্যকায়, কাশ্মীর উপত্যকায়, কাংড়া উপতাকায় ধান উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্য, পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল এবং নদীর ব-দ্বীপগুলিতে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ধান উৎপাদনে ভারতে **পশ্চিমবঙ্গের** স্থান প্রথম। ভারতে
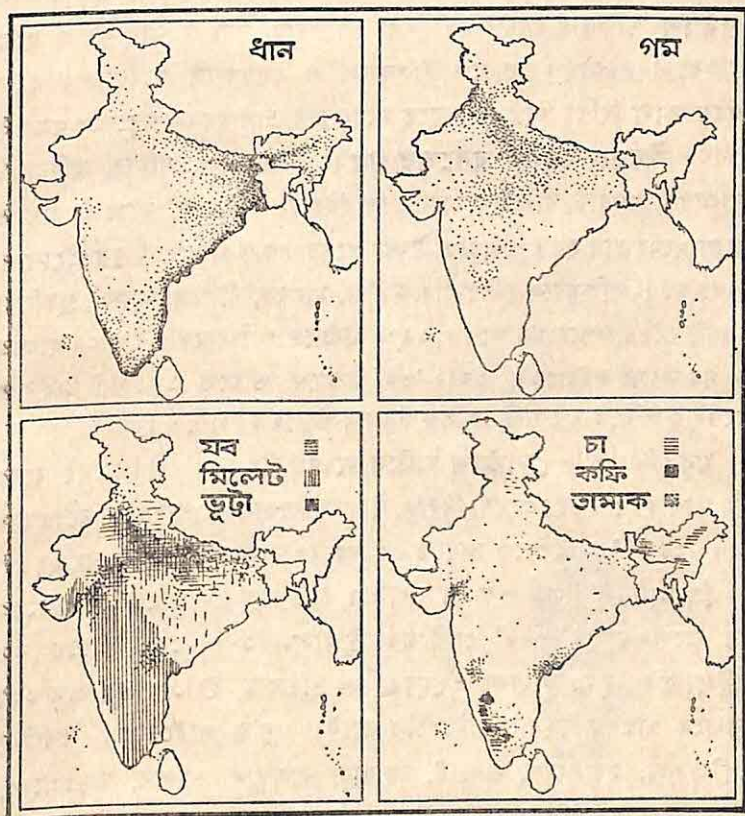
ভারতের খাদ্যশস্য

তিন শ্রেণীর ধান উৎপন্ন হয়। যথা—(১) **আউশ** বা **আশু ধান**—ইহা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করা হয়, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কাটা হয়। (২) **বোরো ধান**—ইহা জলাভূমিতে শীতকালে রোপণ করা হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে কাটা হয়। ইহার চাষ সামান্য। (৩) **আমন ধান**—ইহা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন ও আষাঢ়-শ্রাবণে রোপন করা হয়; অগ্রহায়ণ মাসে এই ধান কাটা হয়। ভারতে

আমন ধানের চাষ বেশী হয়। ধান্য উৎপাদনে পৃথিবীতে চীনের স্থান প্রথম; ভারত দ্বিতীয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৩·৬ কোটি হেক্টেয়ার জমিতে ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টন* চাল উৎপন্ন হইয়াছিল।

গম (Wheat)—খাদ্যশস্য হিসাবে ভারতে ধানের পরই গমের স্থান। ইহা **রবিশস্য** (শীতকালীন শস্য)। গম চাষের জন্য বেশী জলের প্রয়োজন হয় না। ইহার জন্য **বৃষ্টিপাত** ৭৬ সেন্টিমিটার, **উত্তাপ** ১৫·৬° সেন্টিগ্রেড ও উর্বর **দোআঁশ** মৃত্তিকার প্রয়োজন। শস্য পাকিবার সময় সামান্য বৃষ্টি ও প্রচুর সূর্যকিরণের দরকার। ভারতে শীতকালে ও বসন্তকালে গমের চাষ হয়। **মধ্যম তাপ** বিশিষ্ট আর্দ্র জলবায়ুতে গমের চাষ ভাল হয়। ঋতুভেদে গম দুই প্রকার—**শীতের গম** ও **বসন্তের গম**। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে গমের চাষ হয়। ভারতে উৎপন্ন গমের এক-তৃতীয়াংশ **উত্তরপ্রদেশে** উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুরে গম জন্মে। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টন গম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে ২ কোটি ৪৯ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হইয়াছিল।

যব (Barley)—**দোআঁশ** মাটিতে যবেরও চাষ হয়। শীতকালেই যবের চাষ ভাল হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে যবের চাষ হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টন যব উৎপন্ন হয়।

মিলেট (Millets)—জওয়ার, বাজরা, রাগী প্রভৃতি খাদ্যশস্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন ২৪°—২৬° সেন্টিগ্রেড **উত্তাপ**, ১০০ সেন্টিমিটারের কম **বৃষ্টিপাত**। **কৃষ্ণ মৃত্তিকা** ও **দোআঁশ** মৃত্তিকায় ইহাদের চাষ ভাল হয়। বর্তমানে খাদ্যশস্য হিসাবে মিলেটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ—রাজ্যগুলিতে এই জাতীয় শস্যের ব্যবহার দেখা যায়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে মিলেট উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টনের কিছু বেশী।

ভুট্টা (Maize)—**পলিমাটি যুক্ত সমভূমি** ও পার্বত অঞ্চলের কাঁকর মিশ্রিত বা **পড্‌সল** জাতীয় মৃত্তিকায় ভুট্টার চাষ ভাল হয়। ইহার জন্য ৭৬—১০২ সে-মি· **বৃষ্টিপাত** এবং ১৬°—২৬° সে. **উত্তাপের** প্রয়োজন। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হিমালয় অঞ্চল ও বিহারে ইহার চাষ বেশী। উত্তর

*১০০০ কিলোগ্রাম=১ মেট্রিক টন (Ton or tonne)=প্রায় ১ টন (এভ.)।

ভারতে ইহা বহু লোকের খাদ্যশস্য। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রায় ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ৬২ লক্ষ টন ভুট্টা উৎপন্ন হইয়াছিল।

কলাই (Pulses)—ছোলা, মুগ, মসুর, মটর, অড়হর প্রভৃতি কলাইশস্য ভারতের সর্বত্রই শুষ্কস্থানে অল্প বিস্তর উৎপন্ন হয়। ৫০ সে-মি. **বৃষ্টিপাত** হইলেও ইহাদের চাষ হয়। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্যে কলাই জাতীয় শস্য বেশী জন্মে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ২ কোটি ৪ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টন কলাই উৎপন্ন হইয়াছিল।

(খ) পানীয় ও ভেষজ শস্য (Beverages and Drugs)

চা (Tea)—মৃদু উত্তেজক পানীয়রূপে চা ব্যবহৃত হয়। পর্বতের ঢালু অংশে, পার্বত উপত্যকায় এবং অন্যত্র যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় অথচ জল জমিয়া থাকে না এমন স্থানে চা-এর চাষ ভাল হয়। ইহার জন্য ২৪°—২৬° সে. **উত্তাপ** এবং ১৭৫—২২৫ সে-মি. **বৃষ্টিপাতের** প্রয়োজন। জৈব ও উদ্ভিদ্ পদার্থযুক্ত (হিউমাস) এবং লৌহ মিশ্রিত **দোআঁশ মৃত্তিকা** চা-চাষের পক্ষে উপযোগী। উৎকৃষ্ট চা উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ চা **আসাম** রাজ্যে উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের **দার্জিলিং** ও **জলপাইগুড়ি** জেলায়, **ত্রিপুরা** রাজ্যে, উত্তরপ্রদেশের **দেরাদুনে**, হিমাচল প্রদেশের **কাংড়া** উপত্যকায়, কর্ণাটকে, তামিলনাড়ুর **নীলগিরি** ও কার্ডামম্ পাহাড়ের ঢালে, কেরালা রাজ্যের পার্বত অঞ্চলে, বিহারের পূর্ণিয়া, রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলায় চা-এর চাষ হয়। স্বাদে ও গন্ধে **দার্জিলিং** জেলায় উৎপন্ন চা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। আসামের চায়ে উত্তম লিকার প্রস্তুত হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন চা উৎপন্ন হইয়াছিল। চা উৎপাদন ও রপ্তানিতে ভারতের স্থান সর্বোচ্চ। ১৯৭৪-'৭৫ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার চা রপ্তানি করিয়া ২১৩ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছেন।

চা-এর শাখা ও পাতা

কফি (Coffee)—ইহাও মৃদু উত্তেজক পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। কফি একপ্রকার বৃক্ষের ফল (Coffee Berry)। এই ফলের বীজ শুকাইয়া এবং অল্প ভাজিয়া কফি প্রস্তুত করা হয়। কফি চাষের জন্য লৌহ মিশ্রিত **লাল মৃত্তিকা** বিশেষ উপযোগী। সাধারণত ৯১৪ মিটার উচ্চ ও অল্প বৃষ্টিযুক্ত স্থানে কফি ভাল জন্মে। ইহার চাষের জন্য ১৬°—২১° সে. **উত্তাপ** এবং ১৫০—২০০ সে-মি. পর্যন্ত **বৃষ্টিপাতের** দরকার। কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর দক্ষিণভাগে যে সকল অংশে বৃষ্টি কম সেখানে কফি গাছ জন্মে। **নীলগিরি** পর্বতের পূর্ব পার্শ্বে কফি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণভারতে প্রায় ৭,০০০ কফির বাগান আছে। ইহার প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ বাগান কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের মহীশূর, হাসান, সিমাগো ও কাদুর নামক জেলাগুলিতে প্রায় ৪,০০০ কফি বাগান আছে। উড়িষ্যার কোরাপুট ও মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলাতেও কিছু কফি জন্মে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৯০ হাজার টন কফি উৎপন্ন হইয়াছিল।

কফি পাতা, ফুল ও ফল

সিঙ্কোনা (Cinchona)—ইহা পার্বত অঞ্চলে জন্মে। দার্জিলিং ও নীলগিরির পার্বত অঞ্চলে সিঙ্কোনার চাষ হয়। সিঙ্কোনা গাছের বাকল হইতে কুইনাইন নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়।

আফিং (Opium) —ইহা পপী (Poppy) গাছের অপরিপক্ক বীজকোষের রস হইতে তৈয়ারি হয়। এই গাছের বীজকেই পোস্তদানা বলে। আফিং মাদক দ্রব্য বলিয়া গভর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত এবং রাজস্থানে পপীগাছের চাষ হয়।

তামাক (Tobacco)—**উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে** তামাকের চাষ ভাল হয়। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিম-বঙ্গ, উড়িষ্যা ও কেরালায় ইহার চাষ অধিক। তামাক পাতা হইতে সিগারেট

প্রস্তুত হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হইয়াছিল।

(গ) অন্যান্য ফসল

ইক্ষু (Sugar-cane)—**উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে** নদীর অনতিদূরে পলিমাটিযুক্ত সমভূমিতে ইক্ষুর চাষ ভাল হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন ২১° সে.-এর অধিক **উত্তাপ** এবং ১০০ সে-মি. **বৃষ্টিপাত**। চুন ও লবণ মিশ্রিত **দোআঁশ মৃত্তিকা** ইহার চাষের পক্ষে অনুকূল। ইক্ষুগাছের গোড়ায় জল জমিলে ইহার রস নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং জমি হইতে জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত থাকার প্রয়োজন আছে। ভারতে ইক্ষু উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ উল্লেখযোগ্য। তবে **উত্তরপ্রদেশই** ইক্ষু উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইক্ষু হইতে গুড়, চিনি, মিছরি প্রস্তুত হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ২৪ লক্ষ ৮১ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টন ইক্ষু (দণ্ড) উৎপন্ন হইয়াছিল।

তৈলবীজ (Oil Seeds)—সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ি, কার্পাস-বীজ, চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলবীজ পর্যায়ে পড়ে। মানবের খাদ্যে উদ্ভিজ্জ তৈল ব্যবহৃত হয়। ভারতের প্রায় সর্বত্রই এইগুলির কোন না কোনটির চাষ হইয়া থাকে। তৈলবীজ চাষে **দোআঁশ মৃত্তিকা** বিশেষ উপযোগী। **জলবায়ু চরমভাবাপন্ন** অর্থাৎ গ্রীষ্মে গরমের মাত্রা বেশী আবার শীতকালে প্রবল শীত এইরূপ জলবায়ুতে তৈলবীজের চাষ ভাল হয়। ইহার জন্য মধ্যম রকমের **বৃষ্টিপাত** (১০০ সে-মি.) প্রয়োজন। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে ৬৭ লক্ষ টন তৈলবীজ উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতে বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজের উৎপাদক অঞ্চল ও তৈলের ব্যবহার সম্বন্ধে অতঃপর সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

সরিষা (Rape or Mustard)—উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে ইহার চাষ হয়। সরিষা

নানাবর্ণের আছে। শ্বেত ও হল্‌দে সরিষাকে 'রাই' (Rape) বলে। রন্ধনের জন্য সাধারণত সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ৩৩ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার টন সরিষা উৎপন্ন হইয়াছিল।

তিল (Sesamum)—রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে তিলের চাষ অধিক হয়। ইহা প্রধানত দুই প্রকার—কালো ও সাদা। তিলের তৈল রন্ধন ও প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার টন তিল উৎপন্ন হইয়াছিল।

তিসি বা মসিনা (Linseed)—অতসীর (Flax) বীজকে তিসি বলা হয়। এই বীজের জন্য মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, বিহার ও উত্তর প্রদেশে অতসীর চাষ হইয়া থাকে। তিসির তৈল রং ও বার্নিশের কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত, অয়েল ক্লথ (Oilcloth), ছাপার কালি, সাবান প্রস্তুত করিতে তিসির তৈলের প্রয়োজন হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টন তিসি উৎপন্ন হইয়াছিল।

রেড়ি (Castor)—বিহার, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশে রেড়ি বা এরণ্ডের চাষ বেশী হয়। ইহা পিচ্ছিলকারক তৈল হিসাবে কল-কারখানায় যন্ত্রপাতিতে এবং প্রদীপ জ্বালাইতে ব্যবহৃত হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার টন রেড়ি উৎপন্ন হইয়াছিল।

কার্পাস বীজ (Cotton Seed)—কার্পাস গাছের বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া ইহা দ্বারা ভেজিটেবল ঘি (Vegetable Ghee) প্রস্তুত হয়।

গ্রামোফোনের রেকর্ড, মোমবাতি, সাবান, রং, কৃত্রিম মাখন (Margarine) প্রভৃতি তৈয়ারির কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে কার্পাস বীজ উৎপাদিত হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ১৯ লক্ষ ৮০ হাজার টন কার্পাস বীজ উৎপন্ন হইয়াছে।

চীনাবাদাম (Groundnut)—খুব হাল্কা ও উর্বর মৃত্তিকায় ইহার চাষ ভাল হয়। শুষ্ক আবহাওয়াই ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। প্রধানত তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। খাদ্য হিসাবে এবং কোন কোন স্থানে রন্ধনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ ঘি (Vegetable Ghee) প্রস্তুত করিতেও ইহার প্রয়োজন হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৩৯ লক্ষ ২৪ হাজার টন চীনাবাদাম উৎপন্ন হইয়াছিল।

নারিকেল (Cocoanut) ও **শুষ্ক নারিকেলের শাঁস** (Copra)—নারিকেল গাছ প্রধানত সমুদ্রতীরের লবণাক্ত বালুকাময় মৃত্তিকাতেই ভাল জন্মে। **আর্দ্র জলবায়ু** ও ১২০ সেন্টিমিটারের বেশী **বৃষ্টিপাত** ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভারতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা, কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গে। নারিকেলের জল সুস্বাদু পানীয় ও শাঁস সুস্বাদু খাদ্য। ইহার শুষ্ক শাঁস পিষিয়া তৈল প্রস্তুত হয়। এই তৈল রন্ধন কার্যে ও প্রসাধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত নারিকেলের তৈল হইতে সাবান, মোমবাতি, কৃত্রিম মাখন ও উদ্ভিজ্জ ঘি প্রস্তুত হয়। নারিকেলের ছোবড়া দড়ি-শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মসলা (Spices)—আদা, হলুদ, লঙ্কা, গোলমরিচ, মৌরী, ধনে ইত্যাদি মসলা ভারতের সর্বত্র উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলে ও তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশে এলাচি, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ ও তেজপাতা, প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়।

আলু (Potato)—সাধারণত শীতপ্রধান অঞ্চলের উচ্চভূমিতে আলুর চাষ ভাল হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও আসামে আলুর চাষ বেশী হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ৪৪ লক্ষ ৭৩ হাজার টন আলু উৎপন্ন হইয়াছিল।

(ঘ) ভোগ্য বা বাণিজ্যিক শস্য
(Cash Crops or Commercial Crops)

কার্পাস (Cotton)—কার্পাসগাছ চুনমিশ্রিত হালকা **দোআঁশ মাটিতে** জন্মে। দক্ষিণ ভারতের লাভা সঞ্জাত **কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল** কার্পাস উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ স্থান। এই মৃত্তিকার বিশেষত্ব এই যে গাছের গোড়ায় জল জমে না কিন্তু অন্তর্ভূমিতে (Sub-Soil region) জল জমিয়া থাকায় ভূমি অনেক দিন ভিজা থাকে। এই রকম স্থানই তূলাচাষের উপযোগী। কার্পাসের জন্য প্রয়োজন ২৪°—২৬° সে. **উত্তাপ** এবং ৫০—১০০ সে. মি. **বৃষ্টিপাত**। তূলা কার্পাস গাছের বীজের আঁশ। তূলা সাধারণত তিন প্রকারের—**ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত, মধ্যম আঁশযুক্ত** ও দীর্ঘ **আঁশযুক্ত**। দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলা সর্বোৎকৃষ্ট। ইহা রেশম ও পশমের সহিত মিশাইয়া উৎকৃষ্ট কাপড় তৈয়ারি হয়। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষুদ্র-আঁশ-বিশিষ্ট **দেশীয়** কার্পাস জন্মে। পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুতে লম্বা আঁশযুক্ত উৎকৃষ্ট **আমেরিকান** কার্পাসের চাষ হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৭৭ লক্ষ হেক্টেয়ার জমিতে ৫৪ লক্ষ ৮৯ হাজার গাঁইট (১ গাঁইট=১৮০ কে-জি.) কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছিল।
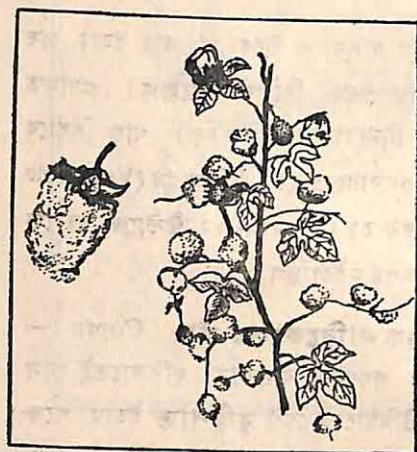
কার্পাস ও কার্পাস বৃক্ষের শাখা

পাট (Jute)—নদীতীরে এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলের আর্দ্র **পলিমাটিতে** বা **দোআঁশ** মাটিতে পাটের চাষ ভাল হয়। পাট চাষের জন্য প্রয়োজন ২৬°-৩৮° সে. **উত্তাপ** এবং **বৃষ্টিপাত** ২০০—২৫০ সে-মি.। মৌসুমী জলবায়ু পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভারতে পাটের চাষ হয় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা ও উত্তরপ্রদেশে। বর্তমানে **পশ্চিমবঙ্গে** পাটের জমির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী পাট জন্মে। পাট অর্থপ্রসূ (Cash) বা বাণিজ্যিক (Commercial) ফসল।

ভারত সরকার কাঁচা পাট ও থলে, কার্পেট, ক্যানভাস প্রভৃতি পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করিয়া প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। ১৯৭২ '৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৭ লক্ষ ৬ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ৪৯ লক্ষ ৭৮ হাজার গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল।

মেস্তা (Mesta)—ইহা পাট-জাতীয় **তন্তু**। পাটের অভাব পূরণ করিবার জন্য ভারতে প্রচুর মেস্তার চাষ হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্যে ইহার চাষ হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ২ লক্ষ ৮৮ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ১১ লক্ষ ৬২ হাজার গাঁইট মেস্তা উৎপন্ন হইয়াছিল।

শণ (Hemp)—পাটের ন্যায় শণও একপ্রকার **তন্তু**। ইহার দ্বারা মজবুত দড়ি তৈয়ারি করা হয়। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে শণ জন্মে।

রবারের নির্যাস সংগ্রহ
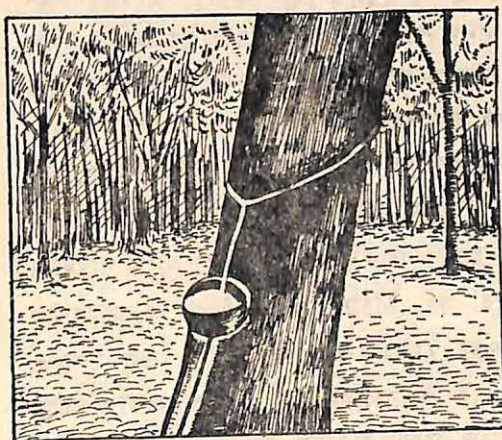
রবার (Rubber)—রবার একপ্রকার বট-জাতীয় বৃক্ষের কাণ্ড নিঃসৃত আঠা। রবার-গাছ সাধারণত নিরক্ষীয় অঞ্চলে জন্মে। ইহা দুই প্রকার—**বন্য** ও **আবাদী**। বন্য রবার গাছ (Wild Rubber) স্বাভাবিক উদ্ভিদের ন্যায় জন্মিয়া থাকে। যে রবার চাষ করিয়া উৎপাদন করা হয় তাহাই আবাদী রবার

(Plantation Rubber)। রবারের চাষের জন্য উর্বর **দোআঁশ মাটি** ২১°—৩৫° সে. **উত্তাপ** এবং ২০০—৩০০ সে-মি. **বৃষ্টিপাতের** প্রয়োজন। কেরালা, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর দক্ষিণাংশে রবার বৃক্ষ জন্মে। ভারতের মোট রবার উৎপাদনের শতকরা ৯২ ভাগ উৎপন্ন হয় **কেরালা** রাজ্যে। ত্রিপুরায় প্রতি হেক্টেয়ারে রবারের উৎপাদন ৭০০—৮০০ কে-জি.। ভারতে রবারের চাহিদা বাড়িতেছে। সাইকেল, মোটর, বিমান প্রভৃতি যানবাহনের টায়ার, টিউব, জুতার তলা, খেলনা, বালিশ, দস্তানা, বর্ষাতি, খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম, গরম জলের ব্যাগ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য রবারের ব্যবহার দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত, বিদ্যুৎ নিরোধক নানাপ্রকার দ্রব্যেও ইহা ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক রবার বেশী উৎপন্ন হয় না বলিয়া কৃত্রিম বা সিন্‌থেটিক (Synthetic) রবার তৈয়ারির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ২ লক্ষ ১৪ হাজার হেক্টেয়ার জমিতে ১ লক্ষ ১২ হাজার টন রবার উৎপন্ন হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

খনিজ সম্পদ

ভারতীয় অর্থনীতিতে **খনিজ সম্পদের** স্থান কৃষির পরেই। শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি অনেকটা খনিজ সম্পদের উপর নির্ভর করে। খনিজ সম্পদ প্রকৃতির দান। এই দেশের শিলাস্তরের অভ্যন্তরে নানাবিধ খনিজ সম্পদ নিহিত আছে ; কিন্তু এই সম্পদ ভারতের সর্বত্র সমপরিমাণে বিতরিত নহে।

দেশের শিল্প-সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে কোনও খনিজ সম্পদের অভাব হইলে উহা পূরণের উপায় বিদেশ হইতে উক্ত দ্রব্য আমদানি বা স্বদেশে বিকল্প ব্যবস্থার উদ্ভাবন। ভারতে কয়লা-সম্পদের পরিমাণ কম। সুতরাং ইহা অধিক পরিমাণে কেবল শিল্প-উদ্যোগেই ব্যবহার করা উচিত। রেল-ইঞ্জিন ও জ্বালানির প্রয়োজনে ইহার ব্যবহার অপচয় মাত্র। ভারতের খনিজ তৈল সম্পদও অপ্রচুর। সেই কারণে, তৈলখনি আবিষ্কারের জন্য ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন। দেশে কয়লা ও খনিজ তৈলের অপ্রাচুর্য হেতু জলজ ও তাপ-বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের দিকে সরকার দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। বড় বড় প্রকল্পের দ্বারা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং আরও হইতেছে।

উত্তোলিত **খনিজ পদার্থের** (Minerals) নাম **আকরিক** (Ore)। খনিজ পদার্থকে সাধারণত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—
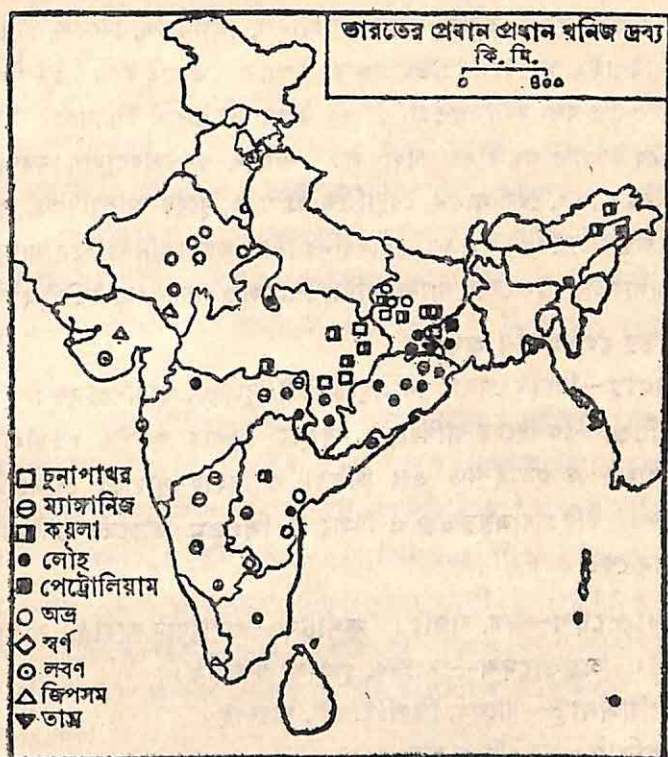
(১) **ধাতব খনিজ পদার্থ** (Metallic Minerals) ও (২) **অধাতব খনিজ পদার্থ** (Non-metallic Minerals)। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীসা, টিন, এ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি ধাতব খনিজ পদার্থ, কয়লা, খনিজ তৈল (পেট্রোলিয়াম), লবণ, অভ্র, এ্যাসবেস্টস, গ্রাফাইট, চুনাপাথর, সিমেণ্ট, মার্বেল, জিপসাম, বালি ইত্যাদি অধাতব খনিজ পদার্থ।

ধাতব খনিজ

লৌহ (Iron)—লৌহ একটি প্রয়োজনীয় ধাতু। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে লৌহের ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারতের খনিসমূহে

আনুমানিক ২,১৬০ কোটি টন লৌহ সঞ্চিত আছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তোলিত লৌহ আকরিকের পরিমাণ ২ কোটি ৪০ লক্ষ টন।

ব্যবহার—আকরিক লৌহ হইতে প্রথমে **কাঁচা** বা **পিণ্ড লৌহ** (Pig Iron) প্রস্তুত হয়। ইহার সহিত ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাংস্টেন প্রভৃতি মিশাইয়া গলাইলে বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত তৈয়ারি হয়। ইহাদিগকে সংকর ইস্পাত বলা হয়। সুতরাং লৌহই ইস্পাতের প্রধান কাঁচামাল। লৌহ হইতে যে ইস্পাত প্রস্তুত হয় তাহা দ্বারা জাহাজ, কল-কারখানার যন্ত্রপাতি, কৃষিকার্যের লাঙ্গল, রেল-লাইন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, গৃহের আসবাবপত্র,, যান-বাহন, অস্ত্র ইত্যাদি নির্মিত হয়। লৌহখনির নিকট কয়লা খনি থাকিলে আকরিক লৌহ গলাইয়া বিশুদ্ধ লৌহ বাহির করিয়া শিল্পকেন্দ্রে পাঠাইবার সুবিধা হয়।

ভারতের লৌহখনি অঞ্চল

বিহার—সিংভূম জেলার নোয়ামুণ্ডি, গুয়া, বুদাবুরু, পানশিরা বুরু।

উড়িষ্যা—কেওঞ্চরের বাগিয়াবুরু, ময়ূরভঞ্জ জেলার অন্তর্গত গরুমহিষিণী, বাদামপাহাড় ও সুলাইপাত এবং উড়িষ্যা ও বিহার সীমান্তে বোনাই-এর কিরিবুরু। উড়িষ্যার **ময়ূরভঞ্জ** ও বিহারের **সিংভূম** ভারতের লৌহখনির সর্বপ্রধান কেন্দ্র।

মধ্যপ্রদেশ—দ্রুগ, বাস্তার। **কর্ণাটক**—বাবাবুদান পাহাড়, সান্দুর ও বেলারী। **অন্ধ্রপ্রদেশ**—নেলোর, কুড্ডাপা ও কুর্নুল।

তামিলনাড়ু—সালেম, তিরুচিরাপল্লী, মাদুরাই।

মহারাষ্ট্র—রত্নগিরি ও চান্দা।

তাম্র (Copper)—খনিজ তাম্রে গন্ধক, লৌহ ও রাসায়নিক সামগ্রী মিশ্রিত থাকে। খনিজ তাম্র চূর্ণ করিয়া জলে ভিজাইয়া অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য মিশাইয়া বিশুদ্ধ তাম্রে পরিণত করা হয়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ১০ লক্ষ ৯৩ হাজার টন তাম্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

ব্যবহার—মুদ্রা, বাসন ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে তাম্র ব্যবহৃত হয়। তামা তাপ ও বিদ্যুতের উত্তম পরিবাহী। এই কারণে বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে তামার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। বর্তমানে তামার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। মুদ্রণের ব্লক প্রস্তুত করিতেও তামার প্রয়োজন হয়। তামার সহিত দস্তা মিশাইলে **পিতল** হয়, তামার সহিত টিন মিশাইলে **ব্রোঞ্জ** হয়,

পিতলের সহিত টিন মিশাইলে **কাঁসা** প্রস্তুত হয়। সোনার সহিত তামা মিশাইয়া **গিনি সোনা** প্রস্তুত হয়। তামার সহিত পিতল মিশাইলে **সিলভার** (জার্মান সিলভার) প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত, টেলিগ্রাফ, শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, মোটর গাড়ি, তাপ সংরক্ষণ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে তাম্র ব্যবহৃত হয়।

প্রাপ্তিস্থান—বিহারের সিংভূম জেলার **ঘাটশিলা** ও **মোসাবনি** তাম্রখনির প্রধান কেন্দ্র। মৌভাণ্ডারে ইহা পরিশোধিত হয়। **মধ্যপ্রদেশের** ইন্দোর, বালাঘাট, জব্বলপুরে ; **রাজস্থানের** ক্ষেত্রী, আলোয়ার, দারিবো, বালাই ও সিনঘানায় ; **অন্ধ্রপ্রদেশের** নেলোর, অনন্তপুর ও কুর্ণুলে ; **কর্ণাটকের** চিত্রদুর্গে ; **উত্তরপ্রদেশের** আলমোড়া ও গাড়োয়ালে ; **কাশ্মীরের** জম্মু-রিয়াসিতে ; **হিমাচল প্রদেশের** কুলু উপত্যকায়, **মণিপুর** ও **সিকিমে** তাম্রখনি আছে।

এ্যালুমিনিয়ম (Aluminium)—এ্যালুমিনিয়মের আকরিককে **বক্সাইট** (Bauxite) বলে ; বক্সাইট চূর্ণ করিয়া ইহার সহিত ক্রায়োলাইট (Cryolite) মিশাইয়া উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগে এ্যালুমিনিয়ম উৎপাদন করা হয়। ইহা শক্ত অথচ হাল্কা। ইহা হইতে এ্যালুমিনিয়মের পিণ্ড, পাত ও তার প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ভারতের ভাণ্ডারে ২৪·৯ কোটি টন বক্সাইট আছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রায় ১ লক্ষ ৭৪ হাজার টন এ্যালুমিনিয়ম উৎপন্ন হয়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে বক্সাইট উত্তোলিত হইয়াছিল ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টন।

ব্যবহার—এ্যালুমিনিয়মের পাত দ্বারা বিমানপোত নির্মিত হয়। এ্যালুমিনিয়ম তাপ ও বিদ্যুৎবাহী। ইহার তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। গৃহস্থালীর বাসনপত্র, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ি, বৈজ্ঞানিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, রং, আতসবাজি প্রস্তুত করিতে ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রাপ্তিস্থান—বিহারের লোহারডাগায় (রাঁচি) ; **উড়িষ্যার** সম্বলপুর ও কালাহাণ্ডিতে ; **মধ্যপ্রদেশের** জব্বলপুর, কাটনি, মাণ্ডলা, বিলাসপুর ও বালাঘাটে ; **কাশ্মীরের** জম্মু অঞ্চলে ; **মহারাষ্ট্রের** কোলাপুর ও থানায় ; **কর্ণাটকের** বাবাবুদান পাহাড়, চিত্রদুর্গ ও বেলগাঁওতে এবং **তামিলনাড়ুর** সালেম অঞ্চলে আকরিক এ্যালুমিনিয়ম বা বক্সাইট পাওয়া যায়।

সীসা (Lead), **দস্তা** (Zinc) ও **টিন** (Tin)—সীসা সাধারণত দস্তা ও রৌপ্যের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। সীসার সঙ্গে অল্প পরিমাণ সোনা, তামা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। অল্প উত্তাপে সীসা গলিয়া যায়। ধাতব অবস্থায় স্বর্ণের সহিত রং বা টিন মিশ্রিত থাকে। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে সীসা ও দস্তা প্রস্তর উত্তোলিত হইয়াছিল যথাক্রমে ৭,৬৭১ ও ২৩,৯১৩ টন।

ব্যবহার—বৈদ্যুতিক শিল্পে সীসার ব্যবহার বেশী। ইহা বিদ্যুৎ পরিবাহী, সেই কারণে জলের নল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তারের আবরণ এবং বন্দুকের গুলি প্রস্তুত করিতে ও মুদ্রণ শিল্পে সীসার ব্যবহার বেশী দেখা যায়। খাদ্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য কার্যে টিনের প্যাকিং বাক্স তৈয়ারি হয়।

প্রাপ্তিস্থান—সীসা ও দস্তা **রাজস্থানের** উদয়পুর এবং **কাশ্মীরের** রিয়াসি খনি অঞ্চলে এবং দস্তা রাজস্থানের জাওয়ারে পাওয়া যায়। **বিহারের** হাজারিবাগ, রাঁচি এবং গয়ায় ; **মহারাষ্ট্রের** হোসেনপুরে টিনের খনি আছে। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত কালিম্পং-এ দস্তা ও সীসার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

স্বর্ণ (Gold), **রৌপ্য** (Silver) ও **প্লাটিনাম** (Platinum)—স্বর্ণ ভারতে খুবই কম পাওয়া যায়। কর্ণাটকের **কোলার** স্বর্ণ খনিতে ভারতের শতকরা ৯৯ ভাগ স্বর্ণ পাওয়া যায়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ৩,৩২০ কে-জি. স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল। কর্ণাটকের রায়চুরেও কিছু স্বর্ণ পাওয়া যায়। কোলার খনিতে কিছু রৌপ্যও পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, বিহারের সিংভূম জেলায় ও রাজস্থানের জাওয়ারে কিছু রৌপ্য পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রে অতি মূল্যবান **প্লাটিনাম** (Platinum) ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

ব্যবহার—অলঙ্কার নির্মাণে স্বর্ণ ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বর্ণ বিনিময় মুদ্রা। অলঙ্কার, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, মুদ্রা, বাসনপত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে রৌপ্যের ব্যবহার দেখা যায়। ফটো, এক্সরে ও অলঙ্কার নির্মাণে প্লাটিনাম ব্যবহৃত হয়।

টাংস্টেন (Tungsten), **ম্যাঙ্গানিজ** (Manganese), **ক্রোমাইট** (Chromite), **মোনাজাইট** (Monazite), **ইলমেনাইট** (Ilmenite) প্রভৃতি সংকর লৌহ প্রস্তুত করিবার ধাতু (Ferro Alloy metals)। খনিজ উলফ্রাম হইতে **টাংস্টেন** ধাতু পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ ভারতের অন্যতম প্রধান খনিজ সম্পদ। ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনে ভারত পৃথিবীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতের ভাণ্ডারে আনুমানিক ১৮ কোটি টন ম্যাঙ্গানিজ সঞ্চিত আছে। ভারতের শতকরা ৬০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ

মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ১৪ লক্ষ ৫১ হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ খনি হইতে উত্তোলিত হইয়াছিল। ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হয়ঃ **মধ্যপ্রদেশের** ছিন্দওয়ারা, জব্বলপুর, বালাঘাট ও ঝাবুয়া অঞ্চলে; **মহারাষ্ট্রের** নাগপুর, ভাণ্ডারা, রত্নগিরি ও পাঁচমহলে; **অন্ধ্রপ্রদেশের** কুর্ণুল, শ্রীকাকুলাম ও বিশাখাপত্তনমে; **কর্ণাটকের** বেলগাও সিমোগা, টুমকুর ও চিত্রদুর্গে; **বিহারের** সিংভূমে; **উড়িষ্যার** ময়ূরভঞ্জ, কালাহাণ্ডি, কোরাপুট, বোনাই, কেওঞ্ঝর ও গাঙ্গপুর অঞ্চলে।

ইস্পাত ও কাঁচশিল্পে ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। রাসায়নিক শিল্পে, রঙীন কাঁচ, বৈদ্যুতিক ব্যাটারী ও ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করিতে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়, বেশীর ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়।

খনিজ ক্রোমিয়ামকে **ক্রোমাইট** বলা হয়। ইস্পাত শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয়। বিহার (সেরাইকেলা), উড়িষ্যা (কেওঞ্ঝর), মহারাষ্ট্র (রত্নগিরি) ও কর্ণাটকে (সিমোগা ও হাসান) ক্রোমাইট পাওয়া যায়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে উত্তোলিত ক্রোমাইটের পরিমাণ ২·৭৭ লক্ষ টন।

ডলোমাইট ধাতুশিল্পে ব্যবহৃত হয়। লৌহ গালাইবার জন্য ইহার আবশ্যক। বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ ও কর্ণাটকে ইহা পাওয়া যায়। কেরালা রাজ্যের সমুদ্রতীরে বালুকার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে **মোনাজাইট** পাওয়া যায়। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ মোনাজাইট ভারতেই পাওয়া যায়। ইহা হইতে **থোরিয়াম** ও **ইউরেনিয়াম** সংগ্রহ করা হয়। থোরিয়াম অধিক ব্যবহৃত হয় গ্যাসের আলোর ম্যাণ্টল তৈয়ারির জন্য। ইহা ব্যতীত, থোরিয়াম ও ইউরেনিয়াম আণবিক শক্তি (Atomic power) উৎপাদনে খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। থোরিয়ামে ভারত সমৃদ্ধ। বিহারে সিংভূমের যদুগুড়ায় (Jaduguda) প্রচুর ইউরেনিয়াম সঞ্চিত আছে। সম্প্রতি তাম্র অনুসন্ধান করিবার সময় উত্তরপ্রদেশের সোনাই অঞ্চলে ইউরেনিয়ামের সন্ধান মিলিয়াছে বলিয়া সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে। কেরালা ও তামিলনাড়ুর সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে **ইলমেনাইট** পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা সাদা রং তৈয়ারি হয়।

অধাতব খনিজ

অধাতব দ্রব্যের মধ্যে **কয়লা, খনিজ তৈল** বা **পেট্রোলিয়াম,** স্বাভাবিক **গ্যাস** প্রভৃতি শক্তি হিসাবে প্রধান।

কয়লা (Coal)—ভারতের সর্বপ্রধান খনিজ দ্রব্য কয়লা। কয়লা উত্তোলনে ভারত পৃথিবীর মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। বিহারের ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লার খনি সর্বপ্রধান। ইহার পর পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জের কয়লার খনি। **ঝরিয়ার** কয়লা সর্বোৎকৃষ্ট। ভারতের ভাণ্ডারে আনুমানিক ৫,১৩৫ কোটি টন কয়লা সঞ্চিত আছে। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। ভারতের কয়লাখনিগুলি দুইভাগে বিভক্ত। যথা—**গণ্ডোয়ানা** যুগের কয়লা খনি ও **টার্সিয়ারী** যুগের কয়লা খনি। ভারতের অধিকাংশ কয়লা (৯৮%) গণ্ডোয়ানা খনি অঞ্চলের, বাকী টার্সিয়ারী খনি অঞ্চলের কয়লা এবং এই কয়লা নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

ভারতের কয়লা উৎপাদনের স্থানসমূহ

অতি প্রাচীন **গণ্ডোয়ানা** যুগের কয়লাখনি সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

বিহার—ঝরিয়া, গিরিডি, করণপুরা, হাজারিবাগ, রামগড়, রাজমহল পাহাড়, ডাল্‌টনগঞ্জ। **পশ্চিমবঙ্গ**—রাণীগঞ্জ। **উড়িষ্যা**—তালচের, রামপুর। **মধ্যপ্রদেশ**—কোর্বা, উমারিয়া, সোহাগপুর, চিরিমিরি, সিঙ্গরোলী, মোহপানী। **অন্ধ্রপ্রদেশ**—সিঙ্গারেনী, তন্দুর, চিন্নুর, বান্দালা। **মহারাষ্ট্র**—চান্দা, ওয়ারোয়া, বাল্লারপুর।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক **টার্সিয়ারী যুগের** নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায় :

আসাম—নাজিরা, মাকুম। **মেঘালয়**—খাসি, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়। **কাশ্মীর**—রিয়াসি। **রাজস্থান**—পালনা (বিকানীর)। **তামিলনাড়ু**—কুড্ডালোর, দক্ষিণ আর্কট। **পশ্চিমবঙ্গ**—দার্জিলিং। **কেরালা**—কুইলন, কান্নানোর।

ব্যবহার—ভারতের লৌহ গালাইবার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার পরিমাণ কম। কয়লা পোড়াইয়া **কোক** কয়লায় পরিণত করা হয় এবং ইহা লৌহ গালাইবার কাজে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত, কোক-কয়লার ধোঁয়া হইতে গ্যাস, আলকাতরা, ন্যাপথালিন, স্যাকারিন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য (byproducts) পাওয়া যায়। এই দেশের কল-কারখানার কাজে এবং রেলগাড়ী, স্টীমার, লঞ্চ প্রভৃতি চালনায়, তাপ-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ও রন্ধনাদি কাজে কয়লা ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গের **দুর্গাপুরে** এবং তামিলনাড়ুর **নেভেলীতে** কোক তৈয়ারির চুল্লী আছে।

খনিজ তৈল (Petroleum)—**পেট্রোলিয়াম** বা **খনিজ তৈল** এক-প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর নির্যাস। অপরিস্রুত অবস্থায় উহা তরল পাঁকের ন্যায় দেখায়। এই তৈলের রং কালো বা পিঙ্গল। শোধন করিবার সময় তাপ প্রয়োগের ফলে প্রথমে **গ্যাস**, তারপর **ন্যাপথা** বাহির হয়। ইহার পর **গ্যাসোলিন** বা **পেট্রোল, ডিজেল তৈল** (Diesel Oil), **কেরোসিন, লুব্রিকেটিং তৈল, এ্যাসফল্ট** বা **পিচ, প্যারাফিন** বা **মোম** প্রভৃতি উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ৭১ লক্ষ ৯৬ হাজার টন খনিজ তৈল উত্তোলিত হইয়াছিল।

ব্যবহার—পেট্রোল বা **গ্যাসোলিন** বর্তমান যুগে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী। মোটরগাড়ী, জাহাজ, বিমানপোত ও বিভিন্ন শিল্পে ইহা ব্যবহৃত হয়। **কয়লার গ্যাস** গৃহস্থের রন্ধনকার্যে, গৃহের উত্তাপ বর্ধন ও শিল্প কার্যে ব্যবহৃত হয়। **ডিজেল তৈল**—ইহা গ্যাস তৈল বা জ্বালানি তৈল নামে পরিচিত। ইহা রেলইঞ্জিন চালনায় ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। **কেরোসিন** গৃহে আলো জ্বালিবার জন্য এবং কলকব্জার ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। **লুব্রিকেটিং তৈল** বা পিচ্ছিলকারী তৈল যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের কলকব্জা মসৃণ ও পিচ্ছিল রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। **এ্যাসফল্ট** রাস্তা তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং **প্যারাফিন** দ্বারা মোমবাতি প্রস্তুত হয়।

ভারতের তৈলখনি ঃ আসামের উত্তর পূর্বাঞ্চলে ডিব্রুগড় জেলায় **ডিগবয়** ও উহার নিকটবর্তী **নাহারকাটিয়া, হুগরিজান** ও **মোরান** অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। এই অঞ্চলের নিকটে বোগাপনিতে স্বাভাবিক গ্যাসও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত, আসামের দক্ষিণে সুরমা উপত্যকায় বদরপুর, পাথুরিয়া, মসিমপুর প্রভৃতি স্থানেও তৈল উত্তোলিত হয়। আসামের **রুদ্রসাগরে** তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুজরাট রাজ্যে আমেদাবাদের নিকটে **কালোলে** এবং কাম্বে উপসাগরের নিকট **লুনেজ, বাদসের, অঙ্কলেশ্বর** প্রভৃতি স্থানে প্রচুর তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

দেশে তৈল সম্পদের অপ্রাচুর্য হেতু বিদেশ হইতে তৈল আমদানি করিতে হয়। ভারতে তৈলের অভাব পূরণের জন্য বর্তমানে সরকার তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের (Oil and Natural Gas Commission) মাধ্যমে দেশের বিভিন্নস্থানে তৈলখনি আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দ

ভারতের পেট্রোলিয়াম
তৈল খনি
তৈলশোধনাগার
৮০°
৯৬°
২৮°
১২°
দিল্লী
মথুরা
বারৌনী
পাটনা
কলিকাতা
হলদিয়া
আহমেদাবাদ
ক্যাম্বে
কালোল
বরোদা
অঙ্কলেশ্বর
লুনেজ
বাদসের
বোম্বাই
ট্রম্বে
বিশাখাপত্তনম
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
মাদ্রাজ
কোচিন
আন্দামান
ও
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
ডিগবয়
মোরান
নুনমাটি
নাহরকাটিয়া
হুগরিজান
রুদ্রসাগর
বঙ্গাইগাঁও
গৌহাটি
পাথারিয়া
মসিমপুর
বদরপুর
কি.মি.
0
৪০০

পর্যন্ত ৯,০৬৪টি তৈলকূপ খনন করা হইয়াছে। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে এই কমিশন কর্তৃক আবিষ্কৃত তৈলখনিসমূহ হইতে ৪০·৩১ লক্ষ টন তৈল উৎপাদিত হইয়াছিল। বোম্বাই-এর অদূরবর্তী আরব সাগরে তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানটি **বম্বে হাই** নামে পরিচিত। এখানে আনুমানিক ৭০ কোটি টন তৈল আছে। সৌরাষ্ট্র হইতে লাক্ষা দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৈল সঞ্চিত আছে। তৈলের সঙ্গে গ্যাসের সন্ধানও মিলিয়াছে। বর্তমানে বম্বে হাইতে তৈল উত্তোলনের কাজ শুরু হইয়াছে। এখান হইতে ২০ লক্ষ টন তৈল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

সম্প্রতি সুন্দরবন হইতে ১৬০ কি-মি. দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভারতের সমুদ্রগর্ভে ইহাই দ্বিতীয় তৈল অনুসন্ধান প্রচেষ্টা। অনতিবিলম্বে কচ্ছ উপসাগরেও তৈল সন্ধান কার্য চলিবে। এতদ্ব্যতীত, নাগাভূমি, অরুণাচল প্রদেশেও তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। হিমাচল প্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তৈল সন্ধানের কার্য চলিবে। তৈল উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিলে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়। ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে ভারত তৈলে স্বয়ম্ভর হইবে আশা করা যায়। ত্রিপুরাতেও প্রচুর পরিমাণে জ্বালানি গ্যাসের সন্ধান মিলিয়াছে। রুশদিগের সহযোগিতায় 'হিন্দ্ অয়েল ডিজাইন ইন্স্টিট্যুট্' এবং দেরাদুনে পেট্রোলিয়াম রিসার্চ ইন্স্টিট্যুট্ গড়িয়া উঠিয়াছে। তামিলনাড়ু রাজ্যের নেভেলিতে কয়লা হইতে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

তৈল শোধনাগার ঃ আসামের **ডিগবয়** ; গৌহাটির নিকট **নুনমাটি**, বিহারের **বারৌণী** ; অন্ধ্রপ্রদেশের **বিশাখাপত্তনম্** ; মহারাষ্ট্রের ট্রম্বে ; গুজরাটের **কয়ালি** ; কেরালার **কোচিন** ; তামিলনাড়ুর **মাদ্রাজ** প্রভৃতি স্থানে তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। আসামের **বঙ্গাইগাঁওতে** নূতন তৈল শোধনাগার নির্মাণের কাজ চলিতেছে। এখানে একটি পেট্রোল ভিত্তিক রাসায়নিক শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। পশ্চিমবঙ্গে **হলদিয়ায়** ও উত্তর প্রদেশের **মথুরায়** তৈল শোধনাগার স্থাপনের কাজ চলিতেছে। হলদিয়ায় একটি সার কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। শোধনাগার ও সার কারখানার মধ্যে

যে পাইপ লাইন বসিবে তাহার সাহায্যে সার কারখানার প্রধান উপাদান জ্বালানি তৈল যোগান দেওয়া যাইবে।

অভ্র (Mica) **:** ইহা খনির মধ্যে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। ভারতে অভ্র ক্ষেত্রের পরিমাণ ২১,৭৬০ বর্গ কি-মি.। অভ্র নানা রং-এর দেখা যায়। শ্বেত-বর্ণের স্বচ্ছ অভ্রকে রুবি অভ্র বলা হয়। উহাকে ইংরাজীতে 'মাস্কোভাইট' (Muscovite) বলে। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট অভ্র। ভারতে এই অভ্র অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। **অভ্র উত্তোলনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান প্রথম।** যত অভ্র উত্তোলন করা হয় তাহার একটা বড় অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তোলিত অভ্রের পরিমাণ ছিল ১৩,৪৭৫ টন।

ব্যবহার : অভ্র তাপসহ। বৈদ্যুতিক শিল্পে অভ্রের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। বেতার, মোটরগাড়ী, বিমানপোতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অভ্রভস্ম ঔষধে ব্যবহার করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান : বিহারের হাজারিবাগ, মুঙ্গের, গয়া, কোডার্মা ভারতের প্রধান অভ্র উৎপাদক অঞ্চল। **কোডার্মায়** উচ্চ শ্রেণীর অভ্র পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত, **অন্ধ্রপ্রদেশের** নেলোর; **রাজস্থানের** জয়পুর, উদয়পুর, আজমীঢ়; **উড়িষ্যার** সম্বলপুর, গঞ্জাম, কোরাপুট; **কর্ণাটকের** হাসান, মহীশূর ও **কেরালার** পুনালুরে অভ্র পাওয়া যায়।

গন্ধক (Sulphur) **:** ভারতের গন্ধকের প্রয়োজন প্রচুর; কিন্তু ইহা খুব সামান্যই এখানে পাওয়া যায়। ইহাকে লৌহ বা তাম্রের সহিত যৌগিক অবস্থায় খনি হইতে উত্তোলন করা হয়। এই যৌগিক পদার্থের নাম **পাইরাইট্স্** (Pyrites)। বারুদ প্রস্তুত করিতে গন্ধকের প্রয়োজন হয়। গন্ধক হইতে 'সালফিউরিক এসিড' তৈয়ারি হয়। ইহা কৃত্রিম সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। বিহারের **আমজোড়ে**, **কর্ণাটকে** এবং **তামিলনাড়ুতে** পাইরাইট্স্ পাওয়া যায়।

সোরা (Saltpetre) **:** ইহা বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায়। ইহা কাঁচশিল্পে, বারুদ ও জমির সার তৈয়ারির জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফসফেট (Phosphate) **:** ইহা দ্বারা প্রচুর রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সার ব্যবহৃত হয়। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও তামিলনাড়ুতে ফসফেট পাওয়া যায়।

কেওলিন (Kaolin) ও **ফায়ার ক্লে** (Fire Clay) : কেওলিন দ্বারা চীনামাটির বাসন এবং ফায়ার ক্লে দ্বারা তাপসহ ইষ্টক প্রস্তুত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে কেওলিন এবং ফায়ার ক্লে পাওয়া যায়।

জিপসাম (Gypsum) : কৃত্রিমসার, সিমেন্ট, কাগজ ও সাল্‌ফিউরিক এ্যাসিড প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। **রাজস্থানের** নাগাউর, বিকানীর, যোধপুর ও জয়শলমীরে; **গুজরাটের** কাঠিয়াবাড়ে; **হিমাচল প্রদেশে**; **কাশ্মীরে**; **তামিলনাড়ুর** তিরুচিরাপল্লী ও তিরুনেলভেলীতে; **অন্ধ্রপ্রদেশের** নেলোর ও গুন্টুরে, জিপসাম পাওয়া যায়। ভারতের শতকরা ৭০ ভাগ জিপসাম রাজস্থানে উত্তোলিত হয়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে উত্তোলিত জিপসামের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টন।

এ্যাস্‌বেস্টস্ (Asbestos) : ইহা অদাহ্য। সিমেন্টের সঙ্গে এ্যাস্‌বেস্টস্ মিশাইয়া ঢেউ খেলানো চাদর তৈয়ারি করিয়া গৃহে ছাউনি দেওয়া হয়। ভারতে এ্যাস্‌বেস্টস্ পাওয়া যায় **কর্ণাটকে, অন্ধ্রের** কুড্ডাপা জেলায় ও **বিহারের** সিংভূম জেলায়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ১১,৭২৭ টন এ্যাস্‌বেস্টস্ উৎপাদিত হইয়াছিল।

চুনাপাথর (Limestone) : ঝিনুক, প্রবাল, শঙ্খ প্রভৃতি জলজ-জীবের দেহাবশেষ জমিয়া চুনাপাথরের সৃষ্টি হয়। ইহা রাস্তাঘাট এবং পাকাবাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। লৌহ গলাইবার কাজে ও সিমেন্ট প্রস্তুত করিতে ইহার প্রয়োজন হয়। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে চুনাপাথর পাওয়া যায়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টন চুনাপাথর উত্তোলিত হইয়াছিল।

লবণ (Salt) : ভারতে তিন প্রকারের লবণ পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় লবণের শতকরা ৭০ ভাগ সমুদ্রের লবণাক্ত জল হইতে তৈয়ারি হয়। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও তামিলনাড়ুতে লবণ তৈয়ারির কয়েকটি বড় বড় কেন্দ্র আছে। **রাজস্থানের** অনেকগুলি হ্রদের জল হইতে লবণ সংগ্রহ করা হয়। জয়পুরের **সম্বরহ্রদ**, যোধপুরের **ফালোদি**, বিকানীরের **লুনকরণসার** প্রভৃতি হ্রদের জল হইতে প্রচুর লবণ উৎপন্ন হয়। ইহা ভিন্ন **হিমাচল প্রদেশের** মাণ্ডি অঞ্চলের খনি হইতে খনিজ লবণ (**Rock salt**) পাওয়া যায়। ইহাকে **সৈন্ধব** লবণ বলা হয়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে উৎপাদিত খনিজ লবণের পরিমান ছিল ৩,৫৯৮ টন।

সপ্তম অধ্যায়

শক্তি সম্পদ

জলস্রোত শুধু জলসেচের পক্ষে উপযোগী নহে, প্রবহমান জলধারা বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের পক্ষেও অপরিহার্য। কলকারখানা ও চাষ আবাদের জন্য বিদ্যুৎ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শক্তি। ভারতে খনিজ তৈল বা পেট্রোলিয়াম বেশী পাওয়া যায় না, কয়লাও প্রচুর নহে। সুতরাং **কয়লা** ও **তৈলজাত শক্তি** অপেক্ষা স্বল্পব্যয়ে **বিদ্যুৎশক্তি** দ্বারা যাবতীয় কলকারখানা চালানো সুবিধাজনক। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি **বিদ্যুৎশক্তি**। বিদ্যুৎশক্তি যতই বৃদ্ধি পাইবে দেশের কলকারখানাগুলির ততই উন্নতি হইবে। ভারতে প্রধানতঃ **তাপবিদ্যুৎ** (Thermal Power) ও **জলজ-বিদ্যুৎ** (Hydro-electric **Power**) এই দুইপ্রকার বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা পোড়াইয়া তাপ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয়। দুর্গাপুর, ব্যাণ্ডেল, সান্তালদি, বোকারো ও চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ব্যতীত, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহের উচ্চগতিতে খরস্রোত ও জলপ্রপাতের সাহায্যে এবং নদীপরিকল্পনায় নানাস্থানে বাঁধের সাহায্যে জলজ-বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। এমন কি পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের খাঁড়িগুলিতে জোয়ার-ভাঁটা হইতেও প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। কয়লা ও তৈলের অপ্রাচুর্য ক্রমশ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রেরণা দিতেছে। সুতরাং দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎশক্তিই প্রধান শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সেই কারণে বড় বড় সেচ প্রকল্পের সহিত বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা সংযুক্ত হইয়াছে।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে দেশে বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ছিল ১৯০ মে-ও. (Mw.)। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তে ৩২০ মে-ও. এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তে (১৯৬১ খ্রীঃ) ৫৬৫ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তে এই বিদ্যুৎশক্তি ১,০১৭ মে-ও. পর্যন্ত বাড়ানো হইয়াছিল। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে তাপবিদ্যুৎ ১,০৭৪·৫ মে-ও., জলজ বিদ্যুৎ ৬৭৮·৬ মে-ও. এবং ডিজেল দ্বারা উৎপন্ন বিদ্যুৎ ৩৬·২ মে-ও., সর্বসমেত ১,৭৮৯·৩ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়াছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তে সর্বপ্রকার বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ছিল ৪৫৭৯ মে-ও.। লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৯,২৬৪ মে-ও.।

আজকাল শহরে গৃহের আলো পাখা হইতে আরম্ভ করিয়া বড় কারখানা, যানবাহন, মাল-চলাচল প্রভৃতি সকল রকমের কার্যই বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্য পাইলে গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্পের উদ্যোগ সম্ভবপর হইবে। সুদূর পল্লী অঞ্চলের লোকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। কামার, কুমার, তাঁতী, গোয়ালা প্রভৃতি বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে পারিলে তাহাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ের উন্নতি হইবে। প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩,০০০ হইতে ৪৫,১৪৪টি **পল্লীতে বৈদ্যুতিকরণ** (Rural Electrification), ২১,০০০ হইতে ৫,১৩,০০০ পাম্পসেট ও নলকূপ বসানো হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দ হইতে বৈদ্যুতিক পাম্পসেট ও নলকূপ স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ১,৫৪,৭৮৬ সংখ্যক গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হইয়াছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ৯,৭৪৩টি হরিজন বস্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে সরকারের ব্যয় হইয়াছিল ৬,৬১২ কোটি টাকা। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে ১ লক্ষ ৬২ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছিয়াছে।

নিম্নে কতকগুলি **বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের** সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

আসাম ও মেঘালয়ঃ—আসামের **নাহারকাটিয়া** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গৌহাটির নিকট **নুনমাটি** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। নাহারকাটিয়া হইতে ৬৯ মে-ও. বিদ্যুৎ নামরূপ সার কারখানায় সরবরাহ করা হইতেছে। নাহারকাটিয়া তৈল উৎপাদন কেন্দ্র হইতে প্রাকৃতিক গ্যাস তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহার করা হয়। এই কেন্দ্রের সরবরাহ শক্তি আরও ৩০ মে-ও. বর্ধিত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। উমট্র নদীর **বিডন জলপ্রপাত** ও শিলং হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে শিলং শহর ও অন্যান্য স্থানে জলজ-বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। শিলং শহরের নিকট **উমিয়াম** নদীতে বাঁধ দিয়া ৫৪ মে-ও. জল-বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গঃ—দামোদর উপত্যকা প্রকল্পে তিলাইয়া, কোনার, মাইথন, পাঞ্চেৎ পাহাড়—এই বাঁধগুলি মোট ১,০৩৯ মে-ও. জলজ-বিদ্যুৎশক্তি বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে সরবরাহ করিতে সক্ষম। **দুর্গাপুর, সান্তালদি, ব্যাণ্ডেল** প্রভৃতি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৩৩০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং পুরুলিয়ায় সান্তালদি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৪৮০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। দুর্গাপুর তাপ-

বিদ্যুৎ কেন্দ্র ২৯০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দামোদর প্রকল্পে ১,১৮১ মে-ও. বিদ্যুৎ (১,০৭৭ মে-ও. তাপ-বিদ্যুৎ এবং ১০৪ মে-ও. জল-বিদ্যুৎ) উৎপন্ন হইতেছে। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পেও ৪ মে-ও. জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পঞ্চম পরিকল্পনায় **ফরাক্কায়** একটি উচ্চ শক্তি সম্পন্ন তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার শেষে ফরাক্কা কেন্দ্র হইতে ২০০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে। এই প্রকল্পের শেষে **কোলাঘাট** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের প্রত্যেক ইউনিটে ২০০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে চলিতেছে। জলঢাকা ও কার্সিয়াং প্রকল্পের কাজ শীঘ্র সম্পন্ন করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ডালখোলায় একটি মধ্যম রকমের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা আছে।

বিহার :—তিলাইয়া, মাইথন, কোনার, পাঞ্চেৎ পাহাড় বাঁধের সাহায্যে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। **বোকারো** এবং **চন্দ্রপুরা** তাপ-বিদ্যুৎ
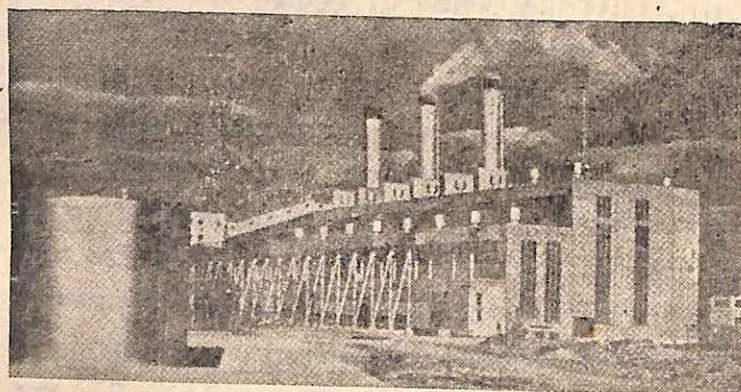
বোকারো তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র

কেন্দ্রে যথাক্রমে ২৪৭·৫ মে-ও. এবং ৪২০ মে-ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। চন্দ্রপুরার চতুর্থ ও পঞ্চম ইউনিট হইতে আরও ২৪০ মে-ও. বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া, হাজারিবাগ জেলার **পাত্রাতু** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৪০০ মে-ও. এবং **বারৌণী** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১৪৫ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। পরে উভয় কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে ২২০ মে-ও. এবং ১১০ মে-ও. বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কুশী পরিকল্পনায় ২০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উড়িষ্যা ঃ—চৌদ্বারের তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ৭ মে-ও, **হীরাকুদ** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র ২৭০ মে-ও. এবং **তালচের** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র ২৫০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ইহার উৎপাদন ক্ষমতা আরও ২২০ মে-ও. বর্ধিত হইবে। এতদ্ব্যতীত, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উড়িষ্যা সরকারের যৌথ উদ্যোগে **বালিমেলা** জল-বিদ্যুৎ প্রকল্পে সিলেরু নদীর উপর বাঁধ সম্পূর্ণ হইলে উড়িষ্যায় ২৬০ মে-ও. শক্তি উৎপন্ন হইবে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ—হরিদ্বার হইতে মীরাট পর্যন্ত সাতটি ছোট জলপ্রপাতের জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ইহাদের নাম যথাক্রমে **বাহাদুরাবাদ, নীরগজনী, চিতৌরা, সালাওয়া, ভোলা, পালৃরা, সুমেরা**। মির্জাপুর জেলার অন্তর্গত পিপরি নামক স্থানে বাঁধ দিয়া **রিহান্দ** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৩০০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। **যমুনা** নদী ও ইহার উপনদী টোন্‌স্ নদীতে বাঁধ দিয়া প্রথম পর্যায়ে ৮৪'৫ মে-ও. জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৬০ মে-ও. বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইবে। গাড়োয়াল জেলায় **রামগঙ্গা** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্য সমাপ্ত হইলে ১৯৮ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হইবে। **হরদুয়াগঞ্জ** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩২০ মে-ও., মির্জাপুর জেলায় **ওব্রা** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ২৫০ মে-ও., **পংকি** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৬৪ মে-ও., **গোরক্ষপুর** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১২ মে-ও., **কানপুর** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪৫ মে-ও., এবং **লক্ষ্নৌ** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১৪ মে-ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা আছে।

মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান ঃ—অমরকণ্টক তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৬০ মে-ও. **কোর্‌বা** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৩০০ মে-ও., **সাতপুরা** (মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের যুগ্ম প্রচেষ্টা) তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৩১২ মে-ও., এবং **চম্বল পরিকল্পনায়** (মধ্য-প্রদেশ ও রাজস্থানের যুগ্ম প্রচেষ্টা) **গান্ধীসাগর** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রথম স্তরে ১১৫ মে-ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয় স্তরে **রাণাপ্রতাপ সাগর** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১৭২ মে-ও., এবং তৃতীয় স্তরে **জহরসাগর** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৯৯ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

পাঞ্জাব ঃ—বিপাশা পরিকল্পনায় (পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও রাজস্থান) ৬৬০ মে-ও., ভাতিন্দা **গুরু নানক** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ২২০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাকে আরও ২২০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন করা হইবে। **ভাক্‌রা-নাঙ্গাল** পরিকল্পনায় গাঙ্গুয়াল এবং কোটলা নামক দুই স্থানে

জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ১,০২৪ মে-ও. জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই পরিকল্পনায় পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য উপকৃত হইতেছে। উচ্চ বারি দোয়াব প্রকল্পে ৪৫ মে-ও. জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। হিমাচল প্রদেশে বিপাশা নদীর উপর প্রকল্প অনুসারে বাঁধ দিয়া জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে।

জম্মু-কাশ্মীর :—বরমুলা জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র হইতে শ্রীনগর এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৯৬ মে-ও. বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। জম্মুর **কালাকোট** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২২·৫ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। রিয়াসীর নিকট চন্দ্রভাগা নদীর উপর বাঁধের সাহায্যে **সালাল** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রে তিনটি ইউনিট স্থাপনের কার্য চলিতেছে। প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ১১৫ মে-ও.।

মহারাষ্ট্র :—পশ্চিমঘাটের লোনাভ্‌লায় **খোপোলি,** নীলামুলায় **ভীরা** ও অন্ধ্র উপত্যকায় **ভিবপুরী** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপন্ন বিদ্যুতের সাহায্যে বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি শহরে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করা হয়। সাতারা জেলায় **কয়না** নদীর উপর বাঁধ দিয়া ৫৪০ মে-ও. বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হইতেছে।

নাগপুরের নিকট **খাপের খেদা** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ১২০ মে-ও., **নাসিক** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ২৮০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে এবং নাগপুরের নিকটে **কোরাদি** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৪৮০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের কার্য চলিতেছে। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের যৌথ উদ্যোগে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে **তারাপুরে আণবিক বিদ্যুৎশক্তি** উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাই ভারতে প্রথম। ইহা ৪০০ মে-ও. বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিতেছে। বোম্বাই-এর নিকটে **ট্রম্বের** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩৩৭·৫ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে।

গুজরাট :—কাম্বে উপসাগরের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত **ধুভারণ** তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনের শক্তি ৫৩০ মে-ও.। **আমেদাবাদের** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন শক্তি ১৩৫ মে-ও.। সুরাট জেলায় তাপ্তী নদীর উপর **উকাই** নামক স্থানে বাঁধের সাহায্যে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে ৩০০ মে-ও., উকাই তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে ২৪০ মে-ও.। এই কেন্দ্রগুলির কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। উত্তর গুজরাটে সবরমতী নদীর তীরে একটি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং ইহার উৎপাদন শক্তি হইবে ২৪০ মে-ও.।

কর্ণাটক :—কাবেরী নদীর **শিবসমুদ্রম্** জলপ্রপাত হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ ১৪১ কি-মি. দূরবর্তী কোলার স্বর্ণখনিতে এবং বাঙ্গালোর শহরে ব্যবহৃত হয়। ইহা ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহাই ছিল প্রথমে ভারতে বৃহৎ জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প। পরে সারাবতী নদীর **গারসোপা** বা **যোগ** জলপ্রপাতের (মহাত্মা গান্ধী জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প) সাহায্যে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। প্রথম পর্যায়ে ইহার উৎপাদন শক্তি ছিল ১৭৮·২ মে-ও., দ্বিতীয় পর্যায়ে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩৬·৬ মে-ও. হইয়াছে। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হইলে আরও ১৭৮·২ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর হস্‌পেটের নিকটে **মালাপুরম**-নামক স্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকল্পের দ্বারা জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে প্রায় ৯৯ মে-ও.।

কেরালা :—পেরিয়ার নদীর বাঁধের সাহায্যে **ইদিক্কি** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র ৩৯০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে সক্ষম। কুইলন জেলার **সবরিগিরি** জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৩০০ মে-ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হইতেছে। ইহা ভিন্ন, **পল্লীভাসল** ও **সেঙ্গুলম** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রদ্বয়ে যথাক্রমে ৭·৫ মে-ও. এবং ৪৮ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে ত্রিবান্দ্রমের নিকট **থুম্বাতে** মহাকাশে রকেট উত্তোলন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ :—উড়িষ্যার সহিত যুক্তভাবে **মাচকুন্দ** নদীর উপর বাঁধ দিয়া ১১৫ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইতেছে। **নাগার্জুন সাগর** পরিকল্পনায় কৃষ্ণা নদীর উপর বাঁধের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ঐ নদীর উপর বাঁধ দিয়া **শ্রীশৈলম** পরিকল্পনা প্রথম পর্যায়ে ৪৪০ মে-ও., এবং পরে আরও ৩৩০ মে-ও. বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে। **কোঠাগুড়ম** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্রে ২৪০ মে-ও., **উচ্চ সিলেরু** জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ১২০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। **নিম্ন সিলেরুতে** ৪০০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

তামিলনাড়ু :—**মেটুর, পাইকারা, পাপনাশনম্** ও **মোয়ার** জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি বিদ্যুৎবাহী তারের সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত এবং ইহারা তামিলনাড়ুর বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতেছে। মেটুরে ২০০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। এই রাজ্যে নীলগিরি অঞ্চলে ভবানীর (কাবেরীর উপনদী) উপনদী **কুণ্ডা** নদীতে কানাডা সরকারের সহায়তায় **এভালেন্স** ও **এমারেল্ড** নামে দুইটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা

গ্রহণ করা হইয়াছে। নীলগিরি অঞ্চলে যে জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপিত হইতেছে, উহা হইবে তামিলনাড়ুর বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ পরিকল্পনা। **কুণ্ডা** জল-বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রথম তিন স্তরের কার্যের ফলে বর্তমানে ৪২৫ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন হইতেছে। মাদ্রাজের নিকটে **এন্নোর** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র বর্তমানে ৩৪০ মে-ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম এবং **নেভেলি** তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র ৬০০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতেছে।

ইহা ছাড়া, দিল্লীর নিকটে ভাদরপুর নামক স্থানে কেন্দ্রীয় তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে এবং ইহার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ৩০০ মে-ও. বিদ্যুৎশক্তি। হিমাচল প্রদেশে বৈরা-সিউল জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলিতেছে। ইহার উৎপাদন শক্তি হইবে ১৮০ মে-ও.।

বিদ্যুৎ ঘাট্তি পূরণের জন্য ভারতে **আণবিক বিদ্যুৎশক্তি** উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম আণবিক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয় মহারাষ্ট্রের **তারাপুরে**। রাজস্থানের **কোটায়** দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তামিলনাড়ুর নিকটে **কলপক্কমে** স্থাপিত হইতেছে। রাজস্থানে কোটার নিকটে রাণাপ্রতাপ পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র ৪২০ মে-ও. বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। কলপক্কম কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতাও ৪২০ মে-ও.। উভয় কেন্দ্রে প্রত্যেকের বর্তমানে ২১০ মে-ও. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার যন্ত্র (unit) আছে। কোটাকেন্দ্রের প্রথম ইউনিট হইতে ২১০ মে-ও. বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে। ইহা ছাড়া, উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশর জেলার **নারোরায়** চতুর্থ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। **ট্রম্বেতে** ভাবা আণবিক গবেষণা কেন্দ্র (Bhaba Atomic Research Centre) স্থাপিত হইয়াছে।

ভারত এখন **পারমাণবিক শক্তির** অধিকারী। আণবিক গবেষণা কমিশন প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে রাজস্থানের মরুভূমিতে একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইবার কাজে সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ন্যায় কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' উৎক্ষেপণও মহাকাশ অভিযানক্ষেত্রে ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্যের বিশিষ্ট নিদর্শন। এই উপগ্রহ কক্ষপথ পরিক্রম করিয়া মহাকাশ সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রেরণ করে। বিশ্বের পরমাণু শক্তির অধিকারীদের মধ্যে বর্তমানে ভারতের স্থান ষষ্ঠ। ভবিষ্যতে পরমাণু শক্তিদ্বারা ভারতের শহর ও সুদূর পল্লীগুলিতে বিদ্যুৎ তরঙ্গ

ব্যাপ্ত হইবে ও কলকারখানা প্রাণবন্ত হইবে। পরমাণু শক্তিকে শান্তির কাজে নিয়োগ করিবার ফলে মানুষের জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইবে। সুতরাং ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরমাণুশক্তির গুরুত্ব অপরিমেয়।

ভারতের **জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র** স্থাপিত হইয়াছে হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, কর্ণাটক, কেরালা মেঘালয় এবং পাঞ্জাবে। মণিপুরে লোগতাক

জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলিতেছে। **তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র** আছে বিহার, দিল্লী, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গে; **তাপ ও জল-বিদ্যুৎকেন্দ্র** আছে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে। **আণবিক-বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র** আছে মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে; তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে নূতন কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের কয়েকটি শ্রমশিল্প

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনার মাধ্যমে **কুটীর শিল্প** ও **বৃহৎ শিল্প**—উভয়প্রকার শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিবার জন্য ভারত সরকার বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছেন। পুরাতন শিল্পগুলির উন্নতি সাধন এবং নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার পক্ষ (Public Sector) এবং বে-সরকারী পক্ষের (Private Sector) প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভারতের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পই সর্বপ্রধান শ্রম শিল্প। ইহা সকল শিল্পের মূল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের লৌহ আকরিক, কয়লা, কোক কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট, ক্রোমিয়াম, ফায়ার ক্লে, চুনাপাথর ইত্যাদি **কাঁচামাল।**

কাঁচা বা **পিণ্ড লৌহ** (Pig iron), **ঢালাই লৌহ** (Cast iron), **পেটাই লৌহ** (Wrought iron), **সংকর ইস্পাত** (Alloy Steel) প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার ছোট বড় ২৩৪টি কারখানা ভারতে আছে। খনিজ বা আকরিক লৌহ প্রাথমিক পরিশোধনের পর কাঁচা বা পিণ্ডলৌহে পরিণত হয়। এই পিণ্ডলৌহকে পরপর আরও শোধন করা হইলে যথাক্রমে ঢালাই ও পেটাই লৌহ পাওয়া যায়। এই লৌহ গরম করিয়া পিটাইলে বাঁকিয়া যায় কিন্তু ভাঙ্গে না। পিণ্ড লৌহ হইতে কার্বন (অঙ্গার) কমাইয়া ইস্পাত তৈয়ারি হয়। ইস্পাতের সহিত ক্রোমিয়াম, নিকেল, অ্যালুমিনিয়ম, তামা ইত্যাদি খাদ মিশাইয়া সংকর ইস্পাত তৈয়ারি হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে উৎপাদিত লৌহপিণ্ডের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৫ লক্ষ টন। ভারতের লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রসিদ্ধ :—

অবস্থান, উৎপত্তির কারণ ও উৎপাদন

(১) **জামসেদপুর** (টাটানগর)—লৌহ ও ইস্পাত কারখানা—টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী (T. I. S. Co.) ভারতের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কারখানা। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দ হইতে এই কারখানায় লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। ইহা বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে অবস্থিত। এই অঞ্চলের অনতিদূরে ঝরিয়া ও বোকারো কয়লা খনি হইতে প্রচুর কয়লা, সিংভূমের গুয়া

ও নোয়ামুণ্ডিতে এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, গরু মহিষিণী, সুলাইপাত, বাদাম পাহাড়, বোনাই ও কেওঞ্ঝরে উৎকৃষ্ট লৌহ আকরিক পর্যাপ্ত পাওয়া যায়। উড়িষ্যার গাংপুরে ম্যাঙ্গানিজ ও চুনাপাথর পাওয়া যায়। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জল সুবর্ণরেখা হইতে পাইবার সুবিধা আছে। এই কারখানায় কোক কয়লা
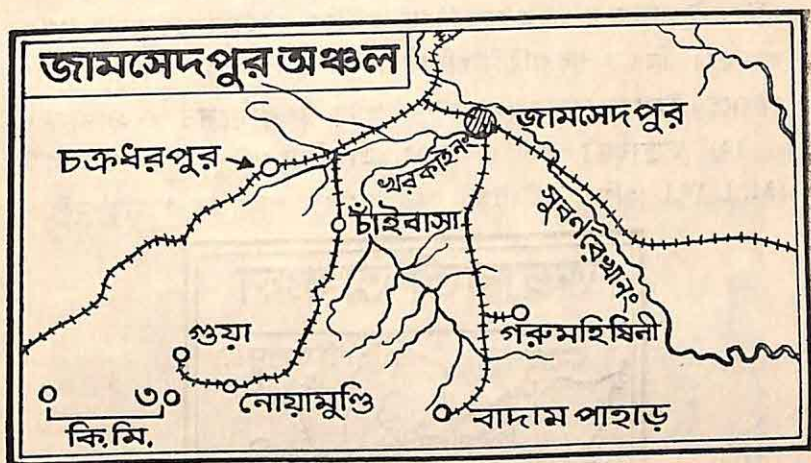
প্রস্তুত করিবার জন্য কোক চুল্লী আছে। বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্য হইতে সুলভে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা এই শিল্পকেন্দ্রটি বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে ২৫০ কি-মি. দূরে অবস্থিত কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ বাজার ও বন্দরের সহিত যুক্ত বলিয়া আমদানি ও রপ্তানির সুবিধা বর্তমান। এই সকল সুবিধা থাকিবার ফলে ছোটনাগপুর অঞ্চলে অবস্থিত জামসেদপুরে (টাটানগরে) এই বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ লৌহ ও ইস্পাত কারখানা।

এই কারখানায় বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাত পিণ্ড (Steel-ingots) উৎপাদিত হইতেছে। ইস্পাত পিণ্ড হইতে ইস্পাতের রড্, সীট, বার, রেল, পেরেক, নাট্ প্রভৃতি ইস্পাত সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত, এই কারখানায় কড়ি, বরগা, ইঞ্জিন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

(২) **বার্নপুর**—পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার বার্নপুরের অন্তর্গত কুলটি ও হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর (I.I.S. Co.) দুইটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা অবস্থিত। ইহারা ভারতের প্রাচীনতম কারখানা। ভারত সরকার এই কারখানাগুলির পরিচালনার ভার

গ্রহণ করিয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই দুই কারখানার জন্য কয়লা রাণীগঞ্জ হইতে সরবরাহ করা হয়। সিংভূমের গুয়া খনি, উড়িষ্যার কেওঞ্জর, বোনাই প্রভৃতি খনি হইতে লৌহ আকরিক, ম্যাঙ্গানিজ এবং গাংপুর হইতে চুনাপাথর আনিয়া কারখানা-গুলিতে ইস্পাত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বিহার ও উড়িষ্যা হইতে সুলভে শ্রমিক সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই কারখানাগুলি সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। ইহাদের বৎসরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষমতা আছে।

(৩) **ভদ্রাবতী**—কর্ণাটক রাজ্যের ভদ্রাবতীতে মহীশূর লৌহ কারখানাটি (M. I. W.) গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যের বাবাবুদান পাহাড় হইতে

উৎকৃষ্ট লৌহ, ভাণ্ডিগুড্ডা হইতে চুনাপাথর, সিমোগা ও কাদুর বনাঞ্চল হইতে সংগৃহীত কাঠ-কয়লা এবং যোগ জলপ্রপাত হইতে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে এই শিল্প কারখানা চালানো হইতেছে। ইহার বৎসরে ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ টন।

উল্লিখিত তিনটি কারখানার মধ্যে জামসেদপুর ও বার্নপুরের কারখানা বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত হইতেছে এবং ভদ্রাবতী কারখানা কর্ণাটক রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার বহুগুণ বাড়িয়া যাওয়ায় ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিঃ (S.A.I.L.) নামে একটি বৃহৎ

প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারত সরকার দেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সহকারী **হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ** নামক সংস্থা কর্তৃক কারখানাগুলি পরিচালিত হইতেছে। ভারত সরকারের নিজ তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলি কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে।

অবস্থান, উৎপত্তির কারণ ও উৎপাদন

(১) **ভিলাই**—মধ্যপ্রদেশের দ্রুগ জেলার অন্তর্গত ভিলাই নামক স্থানে এই কারখানা সোভিয়েট রাশিয়ার সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানকার
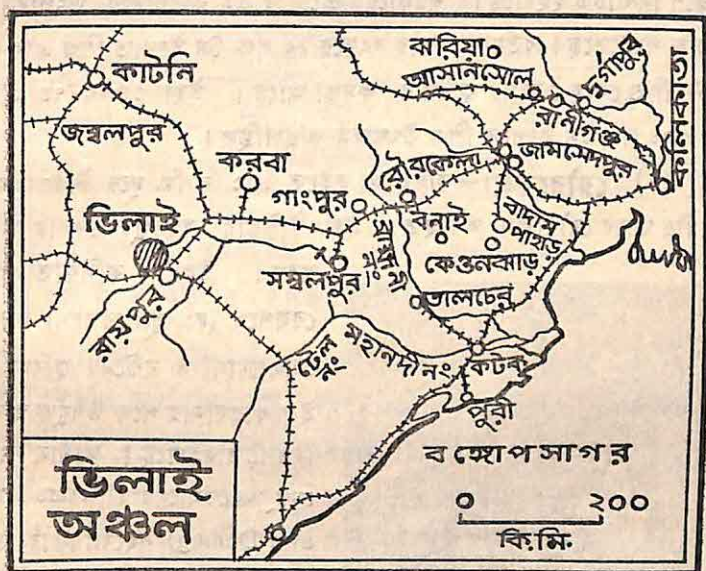
প্রয়োজনীয় লৌহ আকরিক দ্রুগ জেলার ধল্লি ও রাজহারা পাহাড় হইতে এবং চান্দা ও বাস্তারের হাহালাডিড, কোণ্ডাপুখা, চারগাঁও প্রভৃতি স্থানের খনি হইতে সংগ্রহ করা হয়। মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট ও জব্বলপুর হইতে ম্যাঙ্গানিজ, কারগালি, বোকারো, ঝরিয়া এবং কোরবা অঞ্চলের কয়লা, রায়পুর হইতে চুনাপাথর ও ডলোমাইট পাইবার বিশেষ সুবিধা থাকিবার ফলে এই ইস্পাত-কেন্দ্রটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

স্থানীয় তণ্ডুলা খাল হইতে প্রচুর জল পাওয়া যায়। কল চালাইবার জন্য তাপ-বিদ্যুৎ শক্তিও আছে। স্থানীয় এবং নিকটবর্তী বিহার ও উড়িষ্যা হইতে

সুলভে শ্রমিক পাইবার সুবিধা আছে। এই শিল্পকেন্দ্রটি দক্ষিণ-পূর্ব রেল-পথের উপর অবস্থিত। এখানে স্থলপথের যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষভাবে উন্নত। বোম্বাই, বিশাখাপত্তনম ও কলিকাতা—এই তিনটি বন্দরের সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। বিশাখাপত্তনমের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য ভিলাই হইতে ইস্পাত সংগৃহীত হয়। কাঁচামালের সহজলভ্যতা, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, দেশে ও বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা, সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রচুর মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু ইত্যাদি অনুকুল-অবস্থার জন্য মধ্যপ্রদেশের ভিলাই লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপযুক্ত স্থান রূপে নির্বাচিত হইয়াছে। সরকারের প্রচেষ্টায় এই কারখানার উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ইহার বৎসরে ২৫ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড এবং ৫ লক্ষ টন পিণ্ড লৌহ তৈয়ারি করিবার ক্ষমতা আছে। ইহা ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১৮·৯৪ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদন করিয়াছিল।

(২) **রৌরকেলা**—কলিকাতা হইতে ৪১১ কি-মি. দূরে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদীর তীরে রৌরকেলা অবস্থিত। ইহা উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত শহর। ইহা কলিকাতা-বোম্বাই রেলপথে (দঃ. পূঃ. রেলপথ) অবস্থিত, যোগাযোগ ও বণ্টনের সুবিধা হেতু ইহা কারখানার পক্ষে উপযুক্ত স্থানরূপে নির্বাচিত হইয়াছে। জার্মান সংস্থাদ্বয় ক্রুপ্ ও ডেমাগের (Messrs Krupp and Demag) সহযোগিতায় ভারত সরকার এই স্থানে বিরাট ইস্পাতের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। কারখানা হইতে ৮০ কি-মি. দূরে বোনাই অঞ্চলের কিরিবুরু ও বরসুয়ার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ আকরিক এবং কেওঞ্জর ও ময়ূরভঞ্জ জেলার লৌহখনি অঞ্চল হইতেও লৌহ আকরিক সংগ্রহ করা হয়। তালচের ও ঝরিয়ার কয়লা, হীরাকুদের জলবিদ্যুৎ শক্তি, স্থানীয় ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, ডলোমাইট, পরিবহনের সুবিধা, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ হইতে সুলভ শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি অনুকুল অবস্থা এই কারখানা স্থাপনের সহায়তা
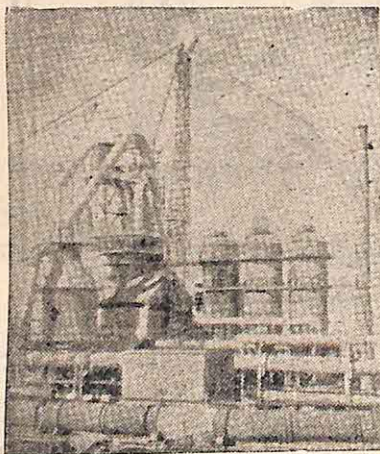
রৌরকেলার ইস্পাত কারখানা

করিয়াছে। এখানে ব্রাহ্মণী নদী ও উহার উপনদী শঙ্খ নদীর মন্দিরা বাঁধের জল পাইবার সুযোগ আছে। শিল্পজাত দ্রব্যগুলি দেশের বাজারে বিক্রয়ের এবং বিদেশে কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করিবার সুবিধা আছে। এই
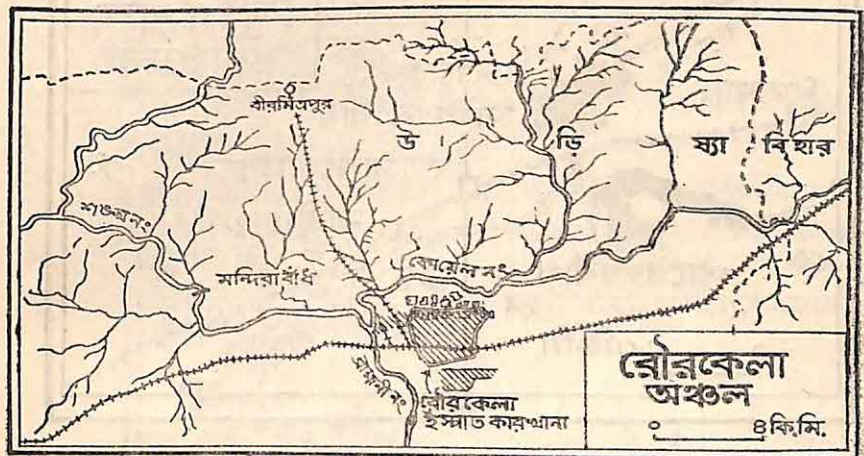
কারখানার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ১৮ লক্ষ টন ইস্পাত-পিণ্ড। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে ইহা ১০·৮৯ লক্ষ টন ইস্পাত-পিণ্ড উৎপাদন করিয়াছিল।

(৩) **দুর্গাপুর**—পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের অনতিদূরে অবস্থিত দুর্গাপুরে ইস্কন (**ISCON**) নামক এক ব্রিটিশ সংস্থার সহযোগিতায় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইহা রেলপথ ও স্থলপথ দ্বারা বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত এবং দামোদরের খাল দ্বারা ত্রিবেণীর নিকট ভাগীরথীর সহিত যুক্ত এবং কলিকাতা বন্দর হইতে ১২৮ কি-মি· দুরে অবস্থিত। এখানে দামোদর নদ হইতে জল এবং স্থানীয় তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইতে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। ঝরিয়া ও রাণীগঞ্জের প্রচুর কয়লা, উড়িষ্যার বাদামপাহাড়, গরুমহিষিণী, সুলাইপাত এবং সিংভূমের গুয়া খনি হইতে লৌহ সহজ লভ্য। চুনাপাথর, ডলোমাইট ও ম্যাঙ্গানিজ মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার বীরমিত্রপুর-হাতিবাড়ী অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হয়। দুর্গাপুরের কোকচুল্লী হইতে প্রচুর কোক কয়লা পাওয়া যায়। কলিকাতা নিকটবর্তী বলিয়া এখানকার শিল্পজাত দ্রব্য কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানি করিবার সুবিধা হইয়াছে।

দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গের শ্রমশিল্প অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদাযুক্ত খরিদ-বাজার আছে। মূলধন ও সুলভ শ্রমিক,
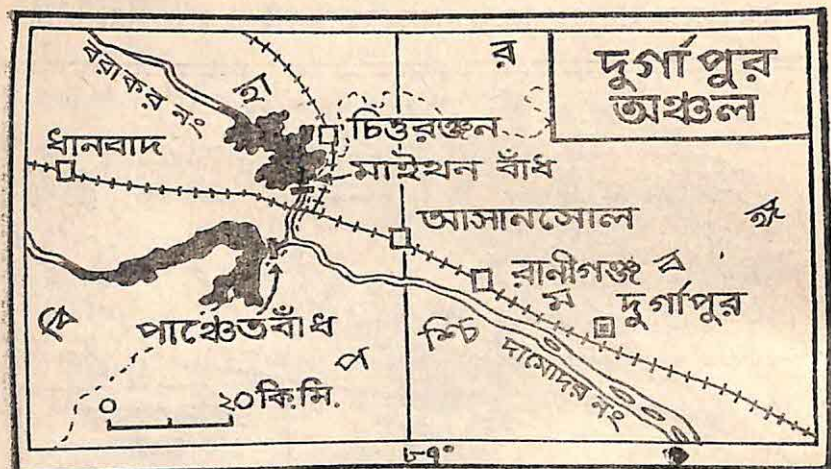
সুদক্ষ কর্মীর অভাব নাই। পশ্চিম জার্মানীর রূঢ় (Ruhr) নদী উপত্যকায় এবং রূঢ় কয়লার খনিকে অবলম্বন করিয়া যেমন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিরাট
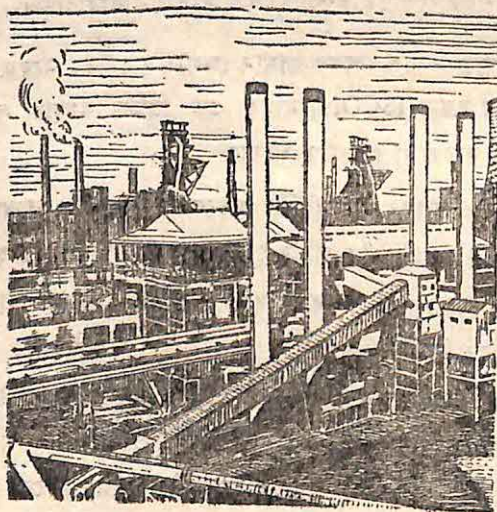
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা

কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের দামোদর উপত্যকায় রাণীগঞ্জ

কয়লার খনির নিকটে দুর্গাপুর কারখানাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কারণেই দুর্গাপুরকে পশ্চিমবঙ্গের **'রূঢ়'** আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে এই কারখানার বাৎসরিক ১৬ লক্ষ টন ইস্পাত-পিণ্ড এবং ৫ লক্ষ টন ঢালাই লৌহ উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে ইহা ৭·৭৬ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করিয়াছিল।

(৪) **বোকারো**—বিহারে দামোদর নদ ও বোকারো নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে এবং বোকারো ও ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলের দক্ষিণে বোকারো লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি অবস্থিত। এই স্থানটি কয়লা ও লৌহখনি অঞ্চল সমূহের সহিত রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। কলিকাতা বন্দরের সহিত রেলপথে
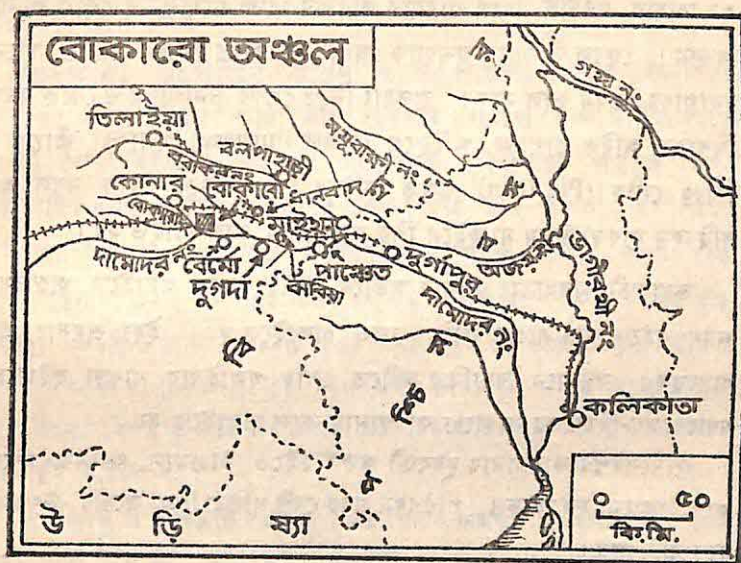
যোগাযোগ থাকিবার ফলে রপ্তানি করিবার সুবিধা আছে। পরিবহন ব্যবস্থা, ঝরিয়া ও বোকারোর কয়লা, বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তে বোনাই অঞ্চলের কিরিবুরু খনির লৌহ এবং সিংভূমের লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ, পালামৌ জেলার ভবনাথপুর ও ডালটনগঞ্জের চুনাপাথর এবং ডলোমাইট, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরের ডলোমাইট, দামোদরের জল, বিহারের সুলভ শ্রমিক, স্থানীয় তাপ-বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি বোকারোতে ইস্পাত কারখানা স্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। এই সংস্থার নাম **বোকারো স্টীল কোম্পানী**। রাশিয়ার সহায়তায় এই

কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি হইতেছে। কলিকাতা, দুর্গাপুর, রাঁচি, ডালমিয়া নগর প্রভৃতি স্থানের শিল্প কারখানাগুলিতে বোকারো কারখানায় উৎপাদিত লৌহ ও ইস্পাতের চাহিদা আছে। ইহার বৎসরে প্রায় ১ কোটি টন (ইস্পাতপিণ্ড ও ঢালাই লৌহ) উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে।

উপরিউক্ত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ব্যতীত চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণে অন্ধ্রপ্রদেশের **বিশাখাপত্তনমে**, তামিলনাড়ুর **সালেমে** এবং কর্ণাটকের হসপেটের নিকটে **বিজয়নগরে** আরও তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু হইয়াছে।

সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ ভারতে যে পরিমাণ লৌহ আকরিক উত্তোলিত হয় তাহার সবটাই শিল্পে ব্যবহার করিবার মতো প্রয়োজনীয় কোক-কয়লার অভাব। কেবল উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার চুনাপাথর উৎকৃষ্ট, অন্যান্য স্থানের চুনাপাথর তেমন ভাল নহে। সুতরাং নিকৃষ্ট শ্রেণীর চুনাপাথর ও কোক কয়লা মিশাইয়া অধিক তাপযুক্ত অগ্নিকুণ্ডে (Blast Furnace) গলাইয়া **কাঁচা** বা **পিণ্ড** লৌহ (Pig Iron) প্রস্তুত করিতে হয়। উৎকৃষ্ট কোক কয়লা এবং পরিবহন ব্যবস্থা উত্তম না হইলে শিল্প কারখানার কাজ ব্যাহত হয়।

ভদ্রাবতী কারখানায় কয়লার অভাবে খনিজ লৌহ গলাইতে অসুবিধা। অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া কাজ চালাইতে হয়। ইহা শ্রমসাধ্য এবং ব্যয়বহুল। বর্তমানে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে লৌহ গলাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এখানে জল-বিদ্যুতের সাহায্যে কারখানার কাজ চালাইতে হয়।

জামসেদপুর কারখানায় দূরবর্তী অঞ্চল হইতে কাঁচামাল আনিয়া শিল্পের কাজ চালানো হইতেছে। পরিবহন খরচ বেশী বলিয়া শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য বৃদ্ধি পায়।

অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের লৌহখনিগুলি কয়লাখনি অঞ্চল হইতে বেশ দূরে অবস্থিত। তামিলনাড়ুর নেভেলিতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা হইতে সিনথেটিক তৈল উৎপাদন করিবার কালে যে কোক পাওয়া যাইবে তাহার সাহায্যে লৌহ গলাইয়া তথায় লৌহ কারখানা স্থাপনের সুবিধা হইবে।

ভারতে মূলধন, সুলভ শ্রমিক, চাহিদাযুক্ত খরিদ বাজার ও পরিবহন ব্যবস্থার অভাব নাই। লৌহশিল্পের জন্য কাঁচামালের বিশেষ অভাব না

থাকিলেও কোক-কয়লার অভাব আছে। সুতরাং কোক-কয়লার অভাব পূরণ করিতে পারিলে ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ভারতে প্রতি বৎসর ১ কোটি টন ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কারখানাগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৭৪-'৭৫ খ্রীস্টাব্দে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে আণবিক বিদ্যুৎশক্তি দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

কার্পাস বয়ন শিল্প

অবস্থান, উৎপত্তির কারণ ও উৎপাদন—কার্পাস বয়নশিল্পই ভারতের বৃহত্তম শিল্প। প্রাচীনকালে চরকার সাহায্যে সুতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বোনা হইত। সেই যুগে এই শিল্পটি কুটীরশিল্পের অন্তর্গত ছিল। এই যান্ত্রিক যুগেও ভারতের তাঁতশিল্প একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। খাদিবস্ত্র শিল্প ও তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য ভারত সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে সমগ্র ভারতে ৬৭৪টি কাপড়ের কল দেখা যায়, তন্মধ্যে ৩৮৪টি সুতাকল, ২৯০টি সুতা ও বয়ন কল। ভারতে ক্ষুদ্র, মধ্যম ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস জন্মে এবং কলে দেশীয় কার্পাসই অধিক ব্যবহৃত হয়। তবে এখনও মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত কার্পাস ভারতকে আমদানি করিতে হয়।

মহারাষ্ট্র ও **গুজরাট** বস্ত্রবয়ন শিল্পে বিশেষ অগ্রণী। অধিকাংশ কাপড়ের কলই এই রাজ্যদ্বয়ে অবস্থিত। গুজরাট রাজ্যের আমেদাবাদে ৭২টি এবং বোম্বাই-এ ৫৯টি কাপড়ের কল আছে। **আমেদাবাদ** ও **বোম্বাই**—এই দুইটি ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। গ্রেটব্রিটেনের ম্যান্‌চেষ্টার একটি বিখ্যাত কার্পাস শিল্পকেন্দ্র। ভারতের ম্যান্‌চেষ্টার বলা হয় আমেদাবাদকে। ইহা ব্যতীত, মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর, পুণা, হুবলী, জলগাঁও, নাগপুর, আকোলা, ওয়ার্ধা অঞ্চলে এবং গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ, বরোদা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক বস্ত্রবয়ন শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

এই অঞ্চলে বস্ত্রবয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার বা **একদেশীভবনের** (locali-sation) কারণ—(১) মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যদ্বয়ের **কৃষ্ণ মৃত্তিকা** অঞ্চলে

প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়। (২) এই দুই অঞ্চলের **জলবায়ু আর্দ্র** হওয়ায় তূলা হইতে সহজেই সুতা তৈয়ারি করিবার সুবিধা আছে। (৩) **বোম্বাই বন্দর** নিকটে থাকায় বিদেশ হইতে বন্দরের মাধ্যমে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তূলা এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করা এবং বিদেশে বস্ত্রাদি রপ্তানি করা সহজসাধ্য। (৪) পশ্চিমঘাট অঞ্চলের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি হইতে **বিদ্যুৎশক্তি** সরবরাহের সুবিধা আছে। (৫) স্থানীয়, দাক্ষিণাত্য ও রাজস্থানের **সুলভ শ্রমিক** এই শিল্পে নিযুক্ত আছে। (৬) এই অঞ্চলে **রেলপথের সুবন্দোবস্ত** আছে। (৭) শিল্প গঠনের জন্য ধনী ব্যবসায়ীদের **মূলধন** এবং ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণ সহজ-লভ্য। (৮) দেশে কার্পাসবস্ত্রের **চাহিদা** এবং **বিক্রয়বাজারের** সুবিধা আছে।

তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটক ও কেরালা—এই চারিটি রাজ্যের কাপড়ের কলের সংখ্যা ১৯৯। ইহার মধ্যে তামিলনাড়ুতেই ১৪৫টি কল আছে। তামিলনাড়ুর **কোয়েম্বাটোর** অঞ্চলে সর্ববৃহৎ কার্পাস বয়নশিল্প কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই রাজ্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বস্ত্র শিল্পকেন্দ্র—মাদ্রাজ, মাদুরাই, তিরুচিরাপল্লী ও সালেম। এতদ্ব্যতীত, **পণ্ডিচেরীতে** ৩টি কাপড়ের কল আছে। কর্ণাটক রাজ্যের প্রধান বস্ত্রবয়ন কেন্দ্র **বাঙ্গালোর**। অন্ধ্রের গুন্টুর, হায়দরাবাদ, ওয়ারেঙ্গল এবং কেরালার ত্রিবান্দ্রম অঞ্চলে বস্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। স্থানীয় চাহিদা, মূলধনের প্রাচুর্য, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, আর্দ্র জলবায়ু প্রভৃতি কার্পাস শিল্প স্থাপনে সহায়তা করিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ভুপাল, উজ্জয়িনী, জব্বলপুর প্রভৃতি শহরাঞ্চলে কাপড়ের কল আছে।

দিল্লী, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে জলসেচ দ্বারা দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের সুবিধা, শ্রমিকের সহজলভ্যতা, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, ভাক্‌রা-নাঙ্গাল হইতে জলবিদ্যুৎশক্তি পাইবার সুবিধা, মূলধনের যোগান প্রভৃতি কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। দিল্লী, লুধিয়ানা, জয়পুর, আজমীঢ়, কানপুর, আগ্রা, বেরিলি, মোরাদাবাদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কার্পাসশিল্প কেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গের কার্পাসশিল্প ভারতে অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ কাপড়ের কলই হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। শ্রীরামপুর, নৈহাটি,

কাঁকিনাড়া, পানিহাটি, সোদপুর, শ্যামনগর প্রভৃতি কার্পাস শিল্পকেন্দ্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার আর্দ্র জলবায়ু, কলিকাতা বন্দরের সান্নিধ্য, উত্তম পরিবহন ব্যবস্থা, স্থানীয় চাহিদা, মূলধনের সুবিধা, রাণীগঞ্জের কয়লা, বিদ্যুৎ-শক্তি প্রভৃতি কার্পাস শিল্প স্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে তুলার অভাব। তুলা উৎপাদক রাজ্যগুলি হইতে এবং বিদেশ হইতে তুলা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। চাহিদা মিটাইবার জন্য মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যগুলি হইতে কাপড় আমদানি করিতে হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে কাপড়ের কলের সংখ্যা অতি অল্প।

বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ হস্তচালিত তাঁত এবং ২·৮৩ লক্ষের অধিক বিদ্যুৎ চালিত তাঁত আছে। উভয় প্রকার তাঁতে ও কলে বৎসরে প্রায় ৮০০ কোটি মিটার কাপড় উৎপাদিত হয়। দেশে কাপড়ের চাহিদা কম-বেশী ১,০৯০ কোটি মিটার। বহির্বাজারে রপ্তানি করিতে ১০০ কোটি মিটার কাপড়ের প্রয়োজন হয়। ২ লক্ষ বেল (১ বেল=১৮০ কে-জি.) কাঁচা তুলাও রপ্তানি হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ৯৭ কোটি কে-জি. সুতা এবং কলে ৪২২·৪ কোটি মিটার কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল; তাঁতে প্রস্তুত হইয়াছিল ৩৭০ কোটি মিটার কাপড়, সমস্ত প্রকার বয়নশিল্পে প্রস্তুত হইয়াছিল মোট ৭৯২·৪ কোটি মিটার কাপড়। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দের উৎপাদন—কার্পাস-সুতা ৯৯·৮ কোটি কিলোগ্রাম এবং মিলের কাপড় ৭৮০ কোটি মিটার।

সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ ভারতের কার্পাস বয়নশিল্পের কতকগুলি সমস্যা আছে। যেমন, কাঁচামাল, তুলা, তাঁত, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। ভারতে উৎপন্ন তুলার অধিকাংশই মাঝারি ও ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বস্ত্র নির্মাণের পক্ষে ইহা অনুপযোগী। এই কারণে মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হইতে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ভারতকে আমদানি করিতে হয়। উৎকৃষ্ট তুলা আমদানি করিতে ভারতকে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। বহুসংখ্যক মিলে পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার ফলে উৎপাদন আশানুরূপ হয় না। কাঁচামাল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়া বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বস্ত্রের অত্যধিক চাহিদা মিটানো সম্ভবপর হইবে না। পশ্চিমবঙ্গে বয়নশিল্পের কাঁচামাল তুলার অভাব। কাঁচামাল কার্পাসের উৎপাদন প্রয়োজনানুরূপ না হইলে কার্পাস শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলে এই শিল্পে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। বায়ুনিয়ন্ত্রিত কারখানা পরিচালনায় খরচ খুব বেশী। হস্তচালিত তাঁতের পরিবর্তে পাওয়ার লুম (বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা চালিত তাঁত) বসাইয়া ধুতি, শাড়ী, গামছা, তোয়ালে, লুঙ্গি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা করিলে তাঁত শিল্পের উন্নতি সাধন হইবে। বয়নশিল্পের উন্নয়নের জন্য কম্পোজিট মিলের (Composite Mill) অর্থাৎ সুতা ও বয়ন কলের ন্যায় পাওয়ার লুমের (Power Loom) উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ভারতকে কার্পাস শিল্পের জন্য দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কার্পাস-বয়নশিল্প কৃষিভিত্তিক। অনেক সময় খরার জন্য কার্পাস উৎপাদন ব্যাহত হয়। সুতরাং জলসেচ দ্বারা কার্পাস উৎপাদন আশানুরূপ করিতে না পারিলে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং বস্ত্রের মূল্যও বৃদ্ধি পায়। শক্তি সম্পদ ও শ্রমিকের অভাব ভারতে নাই, কাঁচামালের প্রাচুর্য হইলেই কার্পাস বয়নশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

পাটশিল্প

অবস্থান, উৎপত্তির কারণ ও উৎপাদন: পাটশিল্প ভারতের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। কারণ কাঁচামাল পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করিয়া ভারত সরকার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন। পাট শিল্পে ভারত পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতে মোট ১১২টি পাটের কল আছে। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রহিয়াছে ১০১টি। ইহা ব্যতীত, উত্তরপ্রদেশে ৩টি, বিহারে ৩টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪টি এবং মধ্যপ্রদেশে ১টি পাটের কল আছে। পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতা-হাওড়া শিল্পাঞ্চলে **পাটশিল্পই** প্রধান শিল্প। হুগলী নদীর উভয় তীরে অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়া হইতে বিড়লাপুর এবং বাঁশবেড়িয়া হইতে উলুবেড়িয়া পর্যন্ত পাটের কলগুলি অবস্থিত। পাটশিল্প এই অঞ্চলে **কেন্দ্রীভূত** (Concentration) হওয়ার কারণ— (১) জলপথে ও রেলপথে বাংলাদেশ হইতে কাঁচা পাট আমদানির সুবিধা; (২) রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে রেলপথে কয়লা আনিবার সুবিধা; (৩) জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত; (৪) আর্দ্র জলবায়ু; (৫) কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি ও যন্ত্রপাতি

হুগলী নদীর তীরবর্তী শিল্পাঞ্চল
০ কি.মি. ২০
০ মাইল ২০
পাটকল
কাপড়ের কল
রেলগাড়ী মেরামতকেন্দ্র
রবার শিল্প
কাগজের কল
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা
দিয়াশলাই কারখানা
চর্মশিল্প ও জুতার কারখানা
লৌহ ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম কারখানা
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
মোটরগাড়ী নির্মান কেন্দ্র
ত্রিবেনী
বাঁশবেড়িয়া
কল্যানী
কাচড়াপাড়া
ব্যাণ্ডেল
হুগলী
হালিশহর
চুঁচুড়া
নৈহাটি
চন্দননগর
ভাটপাড়া
কাঁকিনাড়া
জগদ্দল
শ্যামনগর
চাঁপদানী
ইছাপুর
বৈদ্যবাটি
ব্যারাকপুর
শ্রীরামপুর
টিটাগড়
রিষড়া
খড়দহ
পানিহাটি
কোন্নগর
সোদপুর
আগরপাড়া
উত্তরপাড়া
বেলঘরিয়া
বালী
আলমবাজার
বরাহনগর
বেলুড়
কাশীপুর
হাওড়া
আন্দুল
শালিমার
কলিকাতা
খিদিরপুর
হুগলী নঃ
বাটানগর
চেঙ্গাইল
ফুলেশ্বর
বজবজ
উলুবেড়িয়া
বিড়লাপুর
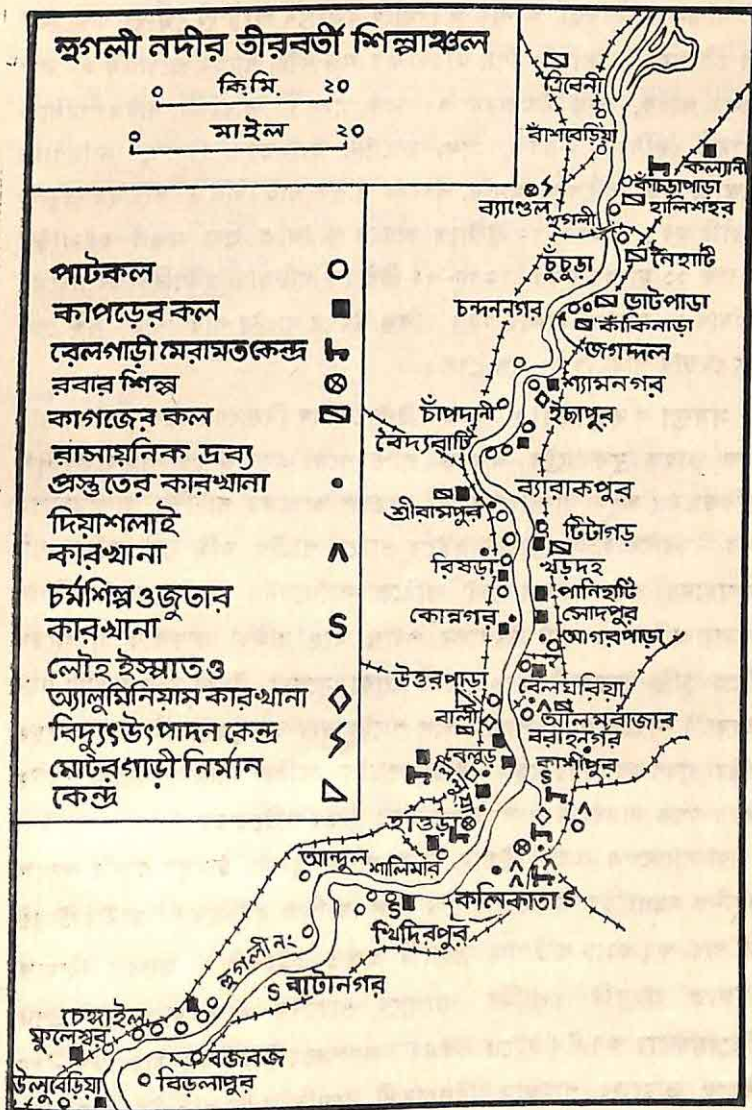
আমদানি সহজসাধ্য ; (৬) বিহার, উড়িষ্যা ও স্থানীয় অঞ্চল হইতে সুলভে শ্রমিক পাইবার সুবিধা এবং (৭) মূলধন প্রাপ্তির সুবিধা।

পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম ও বিহারে বর্তমানে **পাট ও মেস্তা** উভয়েরই চাষ হইতেছে। ভারতে শিল্প কারখানার জন্য কাঁচা পাটের প্রয়োজন ৮০ লক্ষ বেলের অধিক, কিন্তু উৎপাদন ৭০ লক্ষ বেল। ভারতের পাটকলগুলিতে প্রধানত হেসিয়ান (চট), থলে, কার্পেট, ক্যানভাস, ত্রিপল, গানিব্যাগ (বস্তা), দড়ি, পা-পোষ, আসন, পশমের সহিত পাট মিশ্রিত পরিচ্ছদ প্রভৃতি তৈয়ারি হয়। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল ১২ লক্ষ ১১ হাজার টন। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টন। কিন্তু উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৮০ লক্ষ বেল এবং মেস্তার পরিমাণ ২০ লক্ষ বেল।

সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গ বিভাগের ফলে পাটকলগুলি থাকে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গে এবং উৎকৃষ্ট পাট রহিল পূর্ব-পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশে)। সুতরাং ভারতের পাটশিল্প বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল হইল। তখন হইতে ভারতে পাটের জমি বৃদ্ধি করিয়া পাট উৎপাদনের জন্য সরকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাটশিল্পের চাহিদার তুলনায় প্রতিবৎসর পাট উৎপাদন পর্যাপ্ত নহে বলিয়া ভারতকে বাংলাদেশ হইতে চুক্তি অনুযায়ী ১২০ কোটি টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট মানের কাঁচা পাট আমদানি করিতে হয়। পাটের সঙ্গে পাটের ন্যায় তন্তু **মেস্তা** মিশাইয়া পাটের চাহিদা পূরণ করা হইতেছে। কাঁচা পাটের চাহিদা মিটিলেও উৎকৃষ্ট পাটের অভাব বশত ভারতকে বাংলাদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়।

বাংলাদেশেও এখন চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চাঁদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাটের কল স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় উৎকৃষ্ট পাট দ্বারা কম খরচে পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। সুতরাং বিদেশে পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ এখন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে সক্ষম। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতের পাটজাত শিল্পসামগ্রী রপ্তানি ৫,৮৫,০০০ টন, ১৯৭১-'৭২ খ্রীস্টাব্দে ৬,৭৪,১০০ টন এবং ১৯৭৪-'৭৫ খ্রীস্টাব্দে ১,৪৭,০০০ টন। ইহা হইতে বুঝা যায়, বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে ভারতকে পাটচাষের জমি বৃদ্ধি করিয়া উৎকৃষ্ট কাঁচা পাট উৎপাদনে স্বয়ং-

সম্পূর্ণ হইতে হইবে এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া উন্নতমানের পাট সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। শিল্পক্ষেত্রে কাজ চালাইবার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও নিপুণ-শ্রমিকের প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত হইলে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য কম হইবে। পৃথিবীর নানাদেশে আজকাল পাটের বিকল্প হিসাবে কাগজ, কাপড় ও কৃত্রিম তন্তু দ্বারা নির্মিত থলে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে পাটজাত থলের চাহিদা কমিতেছে। বিদেশের বাজারে এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ পাট ও পাটজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

কাগজ শিল্প

অবস্থান, উৎপত্তির কারণ ও উৎপাদন: ভারতে মোট ৫৫টি কাগজের কল আছে। তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৯টি, উত্তরপ্রদেশে ২টি, বিহারে ২টি, উড়িষ্যায় ৩টি, পাঞ্জাবে ৪টি, গুজরাটে ৬টি, মহারাষ্ট্রে ১৪টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ২টি, কর্ণাটকে ৫টি, কেরালায় ২টি, তামিলনাড়ুতে ৩টি এবং মধ্যপ্রদেশে ৩টি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে মহারাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা বেশী কাগজের কল আছে। **মহারাষ্ট্রের** বোম্বাই, পুণা, খোপোলি, বাল্লারপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাগজশিল্প কেন্দ্র। মধ্যপ্রদেশের **নেপানগরে** সংবাদপত্র ছাপিবার কাগজ (News print) প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। **পশ্চিমবঙ্গে** টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, রাণীগঞ্জ, নৈহাটি, ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে কাগজের কল আছে। এতদ্ব্যতীত, আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাগজ শিল্পকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে—যেমন, **বিহারের** ডালমিয়া-নগর, **উড়িষ্যার** চৌদ্বার, ব্রজনগর; **উত্তরপ্রদেশের** লক্ষ্ণৌ, কানপুর ও সাহারাণপুর, **হরিয়ানার** ফরিদাবাদ, জগাধ্রী; **অন্ধ্রের** রাজমুন্দ্রী, শিরপুর; **কর্ণাটকের** ভদ্রাবতী, দন্দেলি; **কেরালার** পুনালুর; **গুজরাটের** আমেদাবাদ প্রভৃতি। কেরালার কোট্টায়ামে নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনের নিমিত্ত একটি কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। উচ্চ শ্রেণীর কাগজ তৈয়ারির জন্য কানাডা ও ফিন্ল্যাণ্ড হইতে কাষ্ঠমণ্ড এবং সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া হইতে নিউজপ্রিন্ট ভারতকে আমদানি করিতে হয়।

ভারতে ৩২টি কাগজ মণ্ড তৈয়ারির কারখানা আছে। কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিতে ভারতে প্রধানত বাঁশ, পাইন গাছের নরম কাঠ, সাবাই ঘাস (Sabai grass), ছেঁড়া কাপড়, খড়, পুরাতন কাগজ প্রভৃতি **কাঁচামাল** এবং কস্টিক সোডা ব্লীচিং পাউডার, সোডা এ্যাশ, ক্লোরিন, সোডিয়াম সাল্‌ফেট্, এ্যালুমিনিয়ম সাল্‌ফেট প্রভৃতি **রাসায়নিক** দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ইক্ষুর ছিবড়া (Bagasse) দ্বারা কাগজ ও শক্ত কার্ডবোর্ড প্রস্তুত হয়। সংবাদ পত্রের কাগজ প্রস্তুত করিতে বাঁশ কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সকল কাঁচামাল ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যতীত স্থানীয় জল ও তাপ-বিদ্যুতের সাহায্যে রাজ্যে কাগজশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভারতে বিভিন্ন রকমের কাগজ প্রস্তুত করিবার কল আছে। যথা, লিখিবার ও ছাপিবার জন্য সাদা কাগজের কল, সংবাদপত্র ছাপিবার জন্য কাগজের কল, টিস্যু কাগজের কল, প্যাকিং করিবার কাগজের কল, দলিলের কাগজের কল ইত্যাদি। ভারতের কলগুলিতে প্রতিবৎসরে ৯·৫৩ লক্ষ টন নানা ধরনের কাগজ উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। **নেপানগরের** কলে সংবাদপত্রের কাগজ ছাপিবার ক্ষমতা বৎসরে ৩০,০০০ টন, উহাকে ৭৫,০০০ টন পর্যন্ত বর্ধিত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। ডালমিয়ানগরের কলে নানা ধরনের পেপারবোর্ড, বাল্লারপুর ও সাহারাণপুরের কলে স্ট্রবোর্ড এবং ত্রিবেণীর কলে টিস্যু-কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে উতকামণ্ডে ভারত সরকার কর্তৃক সিনেমা, এক্স-রে রোল, ফটো, চিত্রশিল্প ইত্যাদির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কাগজ ছাপিবার নিমিত্ত হিন্দুস্তান ফটো ফিল্মস্ ম্যানুফ্যাকচারিং লিঃ নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬·৯৩ কোটি টাকা মূল্যের নানারকম কাগজ ছাপিয়াছিল। মধ্যপ্রদেশের হোসাঙ্গাবাদে নোটের ও দলিলের কাগজ প্রস্তুত হয়। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে পেপার ও পেপার বোর্ড উৎপন্ন হয় ৮ লক্ষ ৩০ হাজার টন এবং নিউজপ্রিণ্টের উৎপাদন ৪৯·৫ হাজার টন।

সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে কাগজের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। কাগজের অভাবে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক ছাপানো কষ্টকর হয়। প্রকাশন শিল্পকে বাঁচাইতে হইলে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের বিরাট চাহিদা মিটাইবার

মতো ক্ষমতা ভারতের কলগুলির নাই। ভারতে নিউজপ্রিণ্ট কাগজের অভাব বলিয়া বিদেশ হইতে নিউজপ্রিণ্ট আমদানি করিতে হয়। ভারতের রৌপ্য ফার, স্প্রুস্ প্রভৃতি বৃক্ষের নরম কাঠের মণ্ডের দ্বারা নিউজপ্রিণ্ট প্রস্তুত করা যায়। হিমালয় ও কাশ্মীরে পাইন জাতীয় নরম কাঠের গাছ আছে, কিন্তু যানবাহনের অসুবিধা থাকায় ইহা মণ্ডের জন্য বিশেষ ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না। সাবাই ঘাস উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায়। বাঁশ আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে প্রচুর পাওয়া যায়। কাষ্ঠমণ্ডের জন্য কেবল বাঁশ, ঘাস ইত্যাদি কাঁচামালের উপর নির্ভর না করিয়া হিমালয়ের পার্বত অঞ্চল হইতে সরলবর্গীয় বৃক্ষের নরম কাষ্ঠ আনয়ন করিবার জন্য পরিবহনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতে কাগজ শিল্পের জন্য সকল রকম উপাদানের এখনও অভাব আছে। কাগজ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উৎকৃষ্ট মণ্ড এবং রাসায়নিক দ্রব্যও কিছু কিছু বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। ভারতের শ্রমিক নিপুণ, বিদ্যুৎশক্তিরও অভাব নাই। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাগজ শিল্পের অগ্রগতির জন্য যেভাবে চেষ্টা চলিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে কাঁচামালের অভাব মিটিলেই ভারতের কলগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধির আশা সমুজ্জ্বল।

সিমেণ্ট শিল্প

অবস্থান, উৎপত্তির কারণ ও উৎপাদন—সিমেণ্ট গৃহাদি, রাস্তা, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য চুনাপাথর, পলিমৃত্তিকা, কয়লা ও জিপসামের প্রয়োজন হয়। যে অঞ্চলে প্রচুর **চুনাপাথর** পাওয়া যায় সেই অঞ্চলেই সাধারণত সিমেণ্ট শিল্প গড়িয়া উঠে। কারণ, চুনাপাথর এই শিল্পের বিশেষ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, আসাম প্রভৃতি রাজ্যে চুনাপাথর পাওয়া যায়। **বিহারে** সর্বাপেক্ষা বেশী সিমেণ্ট প্রস্তুত হয়। এই রাজ্যের সিমেণ্টের কারখানাগুলির মধ্যে ডালমিয়ানগর, সিন্ধ্রি, জাপলা, কল্যাণপুর ও চাইবাসা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য রাজ্যের কারখানাগুলির মধ্যে উড়িষ্যার রাজগাঙ্গপুর; **তামিলনাড়ুর** ডালমিয়াপুরম্, মধুকারাই, তিরুনেলভেলী; **মধ্যপ্রদেশের** জব্বলপুর, সাতনা,

কাটনি, **অন্ধ্রপ্রদেশের** কৃষ্ণা, বিজয়ওয়াড়া ; **গুজরাটের** দ্বারকা, পোরবন্দর, সিকা, ভবনগর, ভেরাবল ; **কর্ণাটকের** ভদ্রাবতী ; **কেরালার** কোট্টায়েম ; **উত্তর প্রদেশের** পিপরি, ব্যালামোর ; **পাঞ্জাবের** ভুপেন্দ্রনগর ; **হরিয়ানার** ডালমিয়া দাদ্রী ; **রাজস্থানের** জয়পুর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। সিমেণ্টের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৭৩-'৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে সিমেণ্ট উৎপাদন হইয়াছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ টন। এ্যাস্‌বেস্টস্ সিমেন্টও ভারতের মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুত হইতেছে ; এইরূপ সিমেণ্টের উৎপাদন ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে ছিল ৪·০৩ লক্ষ টন।

সমস্যা ও সম্ভাবনা : লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপজাত দ্রব্য ধাতুমল (Slag) ; লৌহ গলাইলে চুনাপাথরের গুড়া ও কয়লা ধাতুমলে থাকে এবং সেই ধাতুমল দ্বারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সিমেণ্ট তৈয়ারি হয়। ভারতে রাজস্থানের বিকানীর ও যোধপুর জেলায় **জিপসামের** খনি আছে। এখানকার জিপসাম বিহারের সিমেণ্ট কারখানায় ব্যবহৃত হয়। তামিলনাড়ু, জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তরপ্রদেশে কিছু পরিমাণ জিপসাম পাওয়া যায়। চুনাপাথর ও জিপসাম সকল কারখানার নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত নহে। কয়লার খনি অঞ্চল হইতে বেশির ভাগ সিমেণ্ট কারখানা দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার অভাব ঘটে। ফলে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। ইহা ভিন্ন, সিমেণ্ট কারখানার জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি এবং সিমেণ্ট পরিবহনের জন্য পাটের থলেরও প্রয়োজন। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থায় সিমেণ্টের কাঁচামাল যোগান দিতে পারিলে দক্ষ শ্রমিক, স্বদেশে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে এই শিল্পের উন্নতি হইবে। চাহিদার অনুপাতে প্রত্যেক রাজ্যে সিমেণ্টের কারখানা স্থাপন করা আবশ্যক।

চা-শিল্প

অবস্থান, উৎপত্তির কারণ ও উৎপাদন—চা একটি প্রধান রোপণাত্মক শিল্প (Plantation Industry) ; চা-এর চাষের জন্য ২০°—২৭° সে. তাপ, ১৫০—২৫০ সে-মি. বৃষ্টিপাত এবং দোআঁশ মৃত্তিকার প্রয়োজন। কিন্তু জমিতে

জল জমিয়া থাকিলে চা-চাষের পক্ষে ক্ষতি হয়। সাধারণতঃ **পর্বতের ঢালু** অংশেই চা-এর চাষ খুব ভাল হয়। **পশ্চিমবঙ্গের** দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি
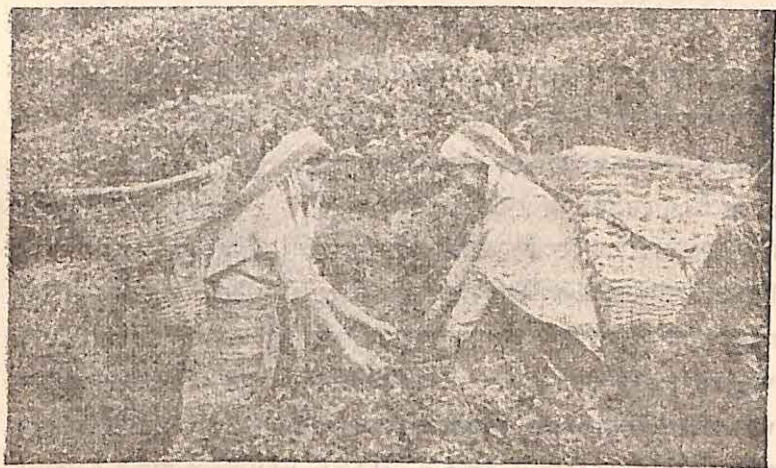
চা-বাগান

জেলায়, **আসামের** প্রায় সর্বত্র, **উত্তরপ্রদেশের** দেরাদুনে, **হিমাচল-প্রদেশের** কাংড়া উপত্যকায়, **তামিলনাড়ুর** নীলগিরি অঞ্চলে, **ত্রিপুরা** ও **কেরালা** রাজ্যে চা-এর চাষ হয়। পৃথিবীর শতকরা ৪০ ভাগ চা ভারতে এবং ভারতের শতকরা ৭২ ভাগ চা আসামে উৎপন্ন হয়। **চা-শিল্পে** পশ্চিম-বঙ্গের স্থান প্রথম। ভারতে প্রায় ৭,০০০ চা-বাগান আছে এবং হাজারের অধিক কারখানাতে চা তৈয়ারি হয়। কারখানাগুলি চা-বাগানের নিকটেই স্থাপিত হইয়াছে। উৎকর্ষের বিচারে **দার্জিলিং-এর চা** সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত; জলপাইগুড়ির চা-এর রং ভাল হয়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে চা উৎপাদিত হইয়াছিল ৪৬·৭৩ কোটি কে-জি. এবং সরকার ১৪৯·৪ কোটি টাকার চা রপ্তানি করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের চা কিছু পরিমাণে স্থানীয় প্রয়োজনে ব্যয় হয়। ইহার অধিকাংশই উচ্চমূল্যে বিদেশে কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি হয়। ভারতের রপ্তানি দ্রব্যসমূহের মধ্যে চা অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্রব্য। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পরই ইহার স্থান। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় চা-এর মান উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতে **টি-বোর্ড**

(Indian Tea Board) এবং অন্যান্য স্থানে টি-কাউন্সিল (Tea Council) স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার বাজারে চা-এর নীলামের পর চা বিদেশে প্রেরিত হয়।

সমস্যা ও সম্ভাবনা : বর্তমানে পৃথিবীর চা-এর বাজারে ভারতীয় চা-এর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ। ভারতে **চা-বাজার সম্প্রসারণ সংস্থা** (Tea Market Expansion Board) বিদেশে চা-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। বিদেশের বাজারে ভারতীয় চা-এর চাহিদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে চা-বাগানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া উচ্চস্তরের চা-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং চা-এর উপর রপ্তানি-শুল্কের পরিমাণ কিছু হ্রাস করিতে হইবে। ভারতীয় টি-বোর্ডকে (চা-সংস্থাকে) দেশের ও বিদেশের বাজারে চা-এর চাহিদা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। চাহিদা অনুযায়ী চা-এর বাক্সের অভাব দূরীকরণের জন্য কারখানাগুলিতে প্লাইউডের বাক্স নির্মাণ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, চা-শিল্প কেন্দ্রে পরিবহনের অসুবিধা দূর করিতে হইবে এবং নিপুণ শ্রমিকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। রাসায়নিক সার ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া চা-এর উৎপাদন ও গুণগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই এই শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

নবম অধ্যায়

যাতায়াত ও পরিবহন-ব্যবস্থা

ভারতের প্রতিটি রাজ্যের বড় বড় শহর ও বন্দর হইতে নানাদিকে রাজপথ, রেলপথ বিস্তৃত রহিয়াছে। রাজপথ রেলপথের পরিপূরক। নৌবাহনোপযোগী খাল খনন করিয়া নাব্য নদীগুলির সহিত সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। ইহাতে জলপথে যাতায়াত ও **অন্তর্বাণিজ্যের** পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, ভারতের প্রধান শহরগুলির উপর দিয়া বিমানপোতও চলিতেছে। ইহাতে দ্রুত যাতায়াতের যেমন সুবিধা হইয়াছে, ডাক চলাচল, শিল্পকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও তেমনি উন্নতি হইয়াছে।

বিমানপথে এখন ভারত হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বড় বড় শহরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যাতায়াত চলে এবং ইহাতে **বহির্বাণিজ্য**ও সম্ভবপর হইয়াছে। রেলগাড়ী, জাহাজ, স্টীমার, মোটর গাড়ী, বিমানপোত ইত্যাদি যানবাহনের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত যেমন সহজ হয় তেমনি শিল্প-বাণিজ্য এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির পথও সুগম হয়।

কাঁচামাল শিল্পকেন্দ্রে আনয়ন এবং শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে প্রেরণ, **পরিবহনের** সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও সুশৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে। দুর্ভিক্ষের সময় এক স্থান হইতে অন্যস্থানে খাদ্যশস্য প্রেরণের জন্য পরিবহন-ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। দেশরক্ষার জন্যও পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব কম নহে। দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে দ্রুত সৈন্য ও রসদ চলাচলের জন্য উত্তম পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে রাজপথ ও রেলপথগুলির উন্নয়ন আবশ্যক।

বিভিন্ন স্থানের ভূ-প্রকৃতি পরিবহন ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, উত্তর ভারতের সমভূমি ও উপকূলের সমভূমি রেলপথ নির্মাণের পক্ষে সুবিধাজনক। কিন্তু উত্তরের পার্বত অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণ সহজসাধ্য নহে। সমভূমিতেই রাস্তাঘাট নির্মাণ ও যানবাহন চলাচলের সুবিধা বেশী। পার্বতভূমির দুর্গম পথ যাতায়াত ও যানবাহন চলাচলের পক্ষে অসুবিধাজনক। সমভূমি অঞ্চল ব্যতীত অন্য অঞ্চলে সহজে বিমান-বন্দর (Aerodrome) নির্মাণ সম্ভব নহে। ইহা ভিন্ন জলপথে পরিবহন ভারতের

সর্বত্র সুবিধাজনক নহে। উত্তর ভারতের নদীগুলি তুষারগলা ও বর্ষার জলে পুষ্ট এবং নাব্য। সেই তুলনায় দক্ষিণ ভারতের নদী শুধু বর্ষার জলে পুষ্ট, বর্ষায় খরস্রোতা এবং গ্রীষ্মে শুষ্কপ্রায়। এজন্য নদীগুলি বিশেষ পরিবহনযোগ্য নহে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবহন-ব্যবস্থাকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা— **স্থলপথ, জলপথ** ও **বিমানপথ**।

স্থলপথ—স্থলপথকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—**সড়ক** ও **রেলপথ**। সড়ক আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—**জাতীয় সড়ক** বা **রাজপথ** (National Highways), **রাজ্য সড়ক** বা **রাজপথ** (State Highways), **জেলা পরিষদ পথ** বা **শাখাপথ** (District Board Roads or Feeder Roads) এবং **গ্রাম্যপথ** (Village Roads)।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিবার পর ভারতে ছিল ৩,৮৮,২২৬ কি-মি. রাস্তা। পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পথগুলির উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং উহাদের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল প্রকার রাস্তা লইয়া ভারতে ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার কি-মি.। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে পাকা রাস্তার সংখ্যা বেশী। **রাজপথ**গুলি বড় বড় নগর, বন্দর, শিল্পাঞ্চল ইত্যাদির মধ্য দিয়া নির্মিত হইয়াছে। ইহারাই দেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলের সংযোজক পথ। এই সকল পাকা (metalled) পথ দিয়া মোটর গাড়ী, ট্রাক, বাস, জীপ, ট্যাক্সী, রিক্সা, ঘোড়ারগাড়ী ইত্যাদি নানাবিধ যানবাহন চলাচল করে। ভারতে জাতীয় রাজপথের সংখ্যা ৫০ ; ইহাদের মোট দৈর্ঘ্য ২৮, ৮৭০ কি-মি., তন্মধ্যে কয়েকটি **প্রধান জাতীয় রাজপথের** (National Highways) উল্লেখ করা হইল।

(ক) ভারতের ঐতিহাসিক রাজপথ (নং ১) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (Grand Trunk Road) (১,৪৯৮ কি-মি. দীর্ঘ) কলিকাতা হইতে অমৃতসর পর্যন্ত বিস্তৃত; ইহা আরও বিস্তৃত হইয়া পাকিস্তান পর্যন্ত গিয়াছে। (খ) **কলিকাতা-মাদ্রাজ রাজপথ** (১,৪৯৩ কি-মি. দীর্ঘ, নং ৫) কলিকাতা হইতে কটক, বিশাখাপত্তনম্, নেলোর হইয়া মাদ্রাজ পর্যন্ত গিয়াছে। (গ) **কলিকাতা-বোম্বাই রাজপথ** (১,৬৫৪ কি-মি. দীর্ঘ, নং ৬) কলিকাতা হইতে নাগপুর হইয়া বোম্বাই পর্যন্ত গিয়াছে। (ঘ) **তামিলনাড়ু-মহারাষ্ট্র রাজপথ** (১,২৪২ কি-মি. দীর্ঘ, নং ৪) মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর ও পুণা হইয়া বোম্বাই শহর পর্যন্ত গিয়াছে।

ভারতের রাজপথ
স্কেল
০ ৪৮০কি.মি.
প্রধান পথ
অন্য পথ
শ্রীনগর
জম্মু
পাঠানকোট
অমৃতসর
লাহোর
সিমলা
আম্বালা
হিসার
দিল্লী
বিকানীর
আগ্রা
আজমীর
জয়পুর
ঝাঁসি
কানপুর
লক্ষ্নৌ
গোরখপুর
কাঠমাণ্ডু
গ্যাংটক
বারাণসী
এলাহাবাদ
পাটনা
পূর্ণিয়া
উদয়পুর
রেওয়া
ভুজ
রাজকোট
আমেদাবাদ
ভূপাল
ইন্দোর
জব্বলপুর
রাঁচী
জামসেদপুর
কলিকাতা
সুরাট
রায়পুর
সম্বলপুর
ধুলিয়া
নাগপুর
পোরবন্দর
বোম্বাই
কটক
ভুবনেশ্বর
পুনা
শোলাপুর
হায়দ্রাবাদ
বিশাখাপত্তনম
রত্নগিরি
বেজওয়াদা
মাদ্রাজ
ম্যাঙ্গালোর
ব্যাঙ্গালোর
সালেম
কালিকট
ত্রিচিরপল্লী
কইম্বাটোর
নেগাপত্তম
মাদুরা
কোচিন
রামেশ্বর
ত্রিবান্দ্রম
কুমারিকা অন্তরীপ
ডিব্রুগড়
তেজপুর
কুচবিহার
গৌহাটি
শিলং
শিলচর
কোহিমা
ইম্ফল
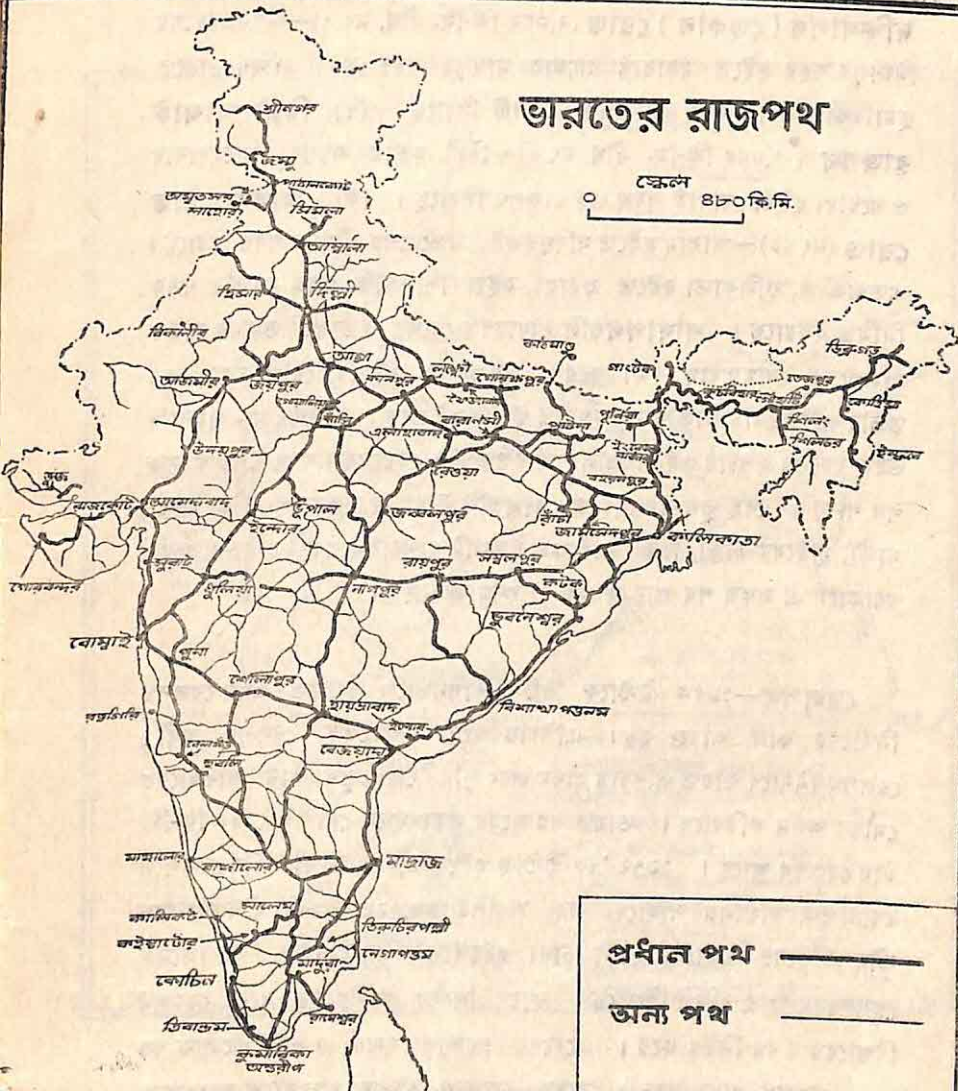
(ঙ) **বোম্বাই-আগ্রা রাজপথ** (১,১৬৭ কি-মি. দীর্ঘ, নং ৩) বোম্বাই শহর হইতে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ঝাঁসি ও আগ্রা পর্যন্ত গিয়াছে। (চ) **গ্রেট দক্ষিণাপথ (ডেকান) রোড** (২,৩৭২ কি-মি. দীর্ঘ, নং ৭)—উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর শহর হইতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের নাগপুর শহর হইয়া দক্ষিণ ভারতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এই প্রশস্ত রাস্তাটি গিয়াছে। (ছ) **দিল্লী-বোম্বাই রাজপথ** (১,৪৩৫ কি-মি. দীর্ঘ, নং ৮)—দিল্লী হইতে জয়পুর, আমেদাবাদ ও বরোদা হইয়া বোম্বাই পর্যন্ত এই রাজপথ গিয়াছে। (জ) **আসাম ট্রাঙ্ক রোড** (নং ৩৯)—আসাম হইতে মণিপুর হইয়া ব্রহ্মদেশের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, কলিকাতা হইতে ফরাক্কা হইয়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত জাতীয় সড়ক নির্মিত হইয়াছে। **শাখাপথ**গুলি সাধারণত দেশের অভ্যন্তর ভাগের সহিত রাজপথের যোগাযোগ রক্ষা করে। এইগুলিকে ফীডার রোড বলা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় সড়কগুলির উন্নতি হইয়াছে। বর্তমানে যানবাহনাদি উন্নত ধরনের হওয়ায় এই পথগুলির আরও উন্নতি হইতেছে। শহরগুলির অনেক পথ পাকা। সেই তুলনায় **গ্রামের পথ**গুলি কাঁচা, ঐ সকল পথ দিয়া গরুর-গাড়ী, মহিষের গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল ইত্যাদি যানবাহন বেশী চলাচল করে। বর্ষাকালে ঐ সকল পথ প্রায় জলমগ্ন বা কর্দমাক্ত থাকে।

রেলপথ—১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে প্রথম রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়। এশিয়ার মধ্যে ভারতেই রেলপথ বেশী। রেলপথ নির্মাণে ভারত এশিয়ায় প্রথম এবং পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করিয়াছে। ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে মোট ৬০,১৪৯ কি-মি. দীর্ঘ রেলপথ আছে। ১৯৭২-'৭৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৪,০৫৫ কি-মি. দীর্ঘ রেলপথে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের সাহায্যে এবং অবশিষ্ট ৫৬,০৯৪ কি-মি. দীর্ঘ রেলপথে স্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ী টানা হইতেছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই রেলপথের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে রেলপথ বিস্তারের উপর নির্ভর করে। এদেশের প্রত্যেক বন্দর ও প্রায় প্রত্যেক বড় শহর রেলপথ দ্বারা যুক্ত। দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্তে যাতায়াত, পণ্যদ্রব্য প্রেরণ, শিল্পের জন্য কাঁচামাল আনয়ন ইত্যাদি বিষয়ে রেলপথ খুবই সাহায্য করে। রেলপথ নির্মাণ করিবার পূর্বে ভূ-প্রকৃতি, শিল্প-বাণিজ্যের পরিস্থিতি, লোকসংখ্যা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করা হইয়া থাকে।

ভারতের রেলপথ
0
৪০০ কিমি.
গোরক্ষপুর
পাণ্ডু
গৌহাটি
কলিকাতা
বোম্বাই
বঙ্গোপসাগর
সেকেন্দরাবাদ
আরব সাগর
মাদ্রাজ
১। নর্দার্ন রেলপথ
২। ওয়েস্টার্ন রেলপথ
৩। সেন্ট্রাল রেলপথ
৪। ইস্টার্ন রেলপথ
৫। সাউথ ইস্টার্ন রেলপথ
৬। সাদার্ন রেলপথ
৭। নর্থ-ইস্টার্ন রেলপথ
৮। নর্থ-ইস্ট-ফ্রন্টিয়ার রেলপথ
৯। সাউথ সেন্ট্রাল রেলপথ
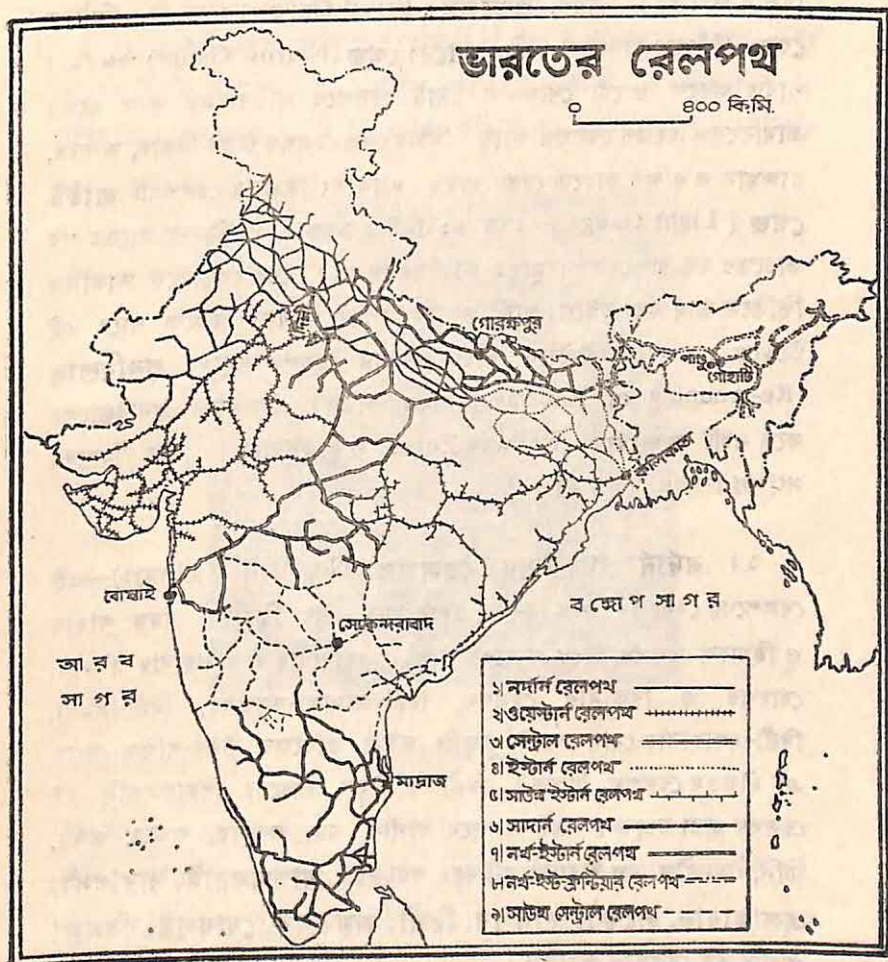
পার্বতভূমি, মালভূমি সমভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন **প্রাকৃতিক** অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থান বিশেষে বিভিন্ন মাপের (Gauge) রেলপথ নির্মিত হয়। রেলপথের দুইটি লাইনের ব্যবধান বা মধ্যবর্তী দূরত্ব অনুসারে গেজের শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। যেমন, **ব্রডগেজ** (Broad Gauge) ১·৬৮ মি., **মিটার গেজ** (Metre Gauge) ১ মি., **ন্যারো গেজ** (Narrow Gauge) ·৭৬ মি.। পার্বত অঞ্চলে ন্যারো গেজে বা ছোট রেলপথে পরিবহনের কাজ চলে। গ্রামাঞ্চলেও এইরূপ রেলপথ আছে। মিটার গেজ রেলপথ উত্তর বিহার, আসাম, রাজস্থান ও দক্ষিণ ভারতে দেখা যায়। দার্জিলিং হিমালয় রেলপথটি **লাইট গেজ** (Light Gauge)—মাত্র ·৬১ মিটার চওড়া। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বড় বড় রেলপথসমূহের জাতীয়করণ হয়। রেলপথগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করা হইলে গাড়ী চলাচল অধিক কার্যকরী হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১-'৫২ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার রেলপথ সমূহের **পুনর্বিন্যাস** (Re-grouping of Railways) সাধন করেন। রেলপথের পুনর্বিন্যাসের ফলে নয়টি **অঞ্চলের** (Railway Zones) সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

১। **নর্দার্ন** বা **উত্তর রেলপথ** (Northern Railways)—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০, ৬৮৭ কি-মি., ইহার সদর দপ্তর **দিল্লী**। সমস্ত পাঞ্জাব ও হিমাচল রেলপথ, উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ ও এলাহাবাদ বিভাগ, যোধপুর ও বিকানীর রেলপথ, দিল্লী-আম্বালা-অমৃতসর, দিল্লী-সিমলা, দিল্লী-এলাহাবাদ-মোগলসরাই প্রভৃতি লইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে এই দীর্ঘতম রেলপথ বিস্তৃত। দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের শিল্পাঞ্চলগুলি এই রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। এই রেলপথে কার্পাস, গম, জওয়ার, বাজরা, পশম, চিনি, তৈলবীজ, বস্ত্র ইত্যাদি পরিবহন করা হয়। **মোগলসরাই, বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লী, অমৃতসর, যোধপুর, সিমলা** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

২। **ওয়েস্টার্ন** বা **পশ্চিম রেলপথ** (Western Railways)—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১০, ১৪৭ কি-মি., ইহার সদর দপ্তর **বোম্বাই** (চার্চগেট)। রাজস্থানের অধিকাংশ, সম্পূর্ণ গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশের কিয়দংশ ও মহারাষ্ট্রের উত্তরদিকের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্গত। কার্পাস, গম,

জওয়ার, খনিজ লবণ, জিপসাম, তৈলবীজ, শিল্পজাত ও রাসায়নিক দ্রব্য এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। **জয়পুর, আজমীঢ়, আমেদাবাদ, সুরাট, বরোদা, ভবনগর, রাজকোট** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

৩। **সেন্ট্রাল বা মধ্য রেলপথ** (Central Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য ৬,০১৩ কি-মি., ইহার প্রধান কার্যালয় **বোম্বাই** (ভি. টি.)। উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের
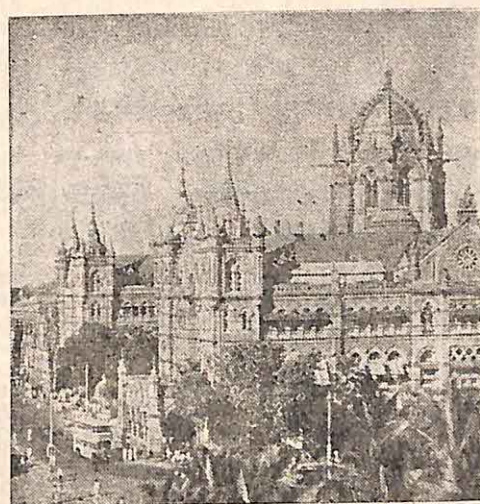
বোম্বাই ভি. টি.

কিয়দংশে এই মধ্য অঞ্চলের রেলপথ বিস্তৃত। এই রেলপথে গম, কার্পাস, চিনি, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা, সিমেন্ট প্রভৃতি পরিবহন করা হয়। **ঝাঁসি, ভুপাল, মনমদ, পুণা, হায়দরাবাদ, জব্বলপুর, নাগপুর, রায়চুর** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

৪। **ইস্টার্ণ বা পূর্ব রেলপথ** (Eastern Railways)—এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪,২২৯ কি-মি., ইহার সদর দপ্তর **কলিকাতা**। পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-প্রদেশের পূর্বাংশ ও বিহার ইহার অন্তর্গত। এই রেলপথে কয়লা, আকরিক লৌহ, ধান, গম, পাট, সার, চা, চিনি প্রভৃতি পণ্য পরিবাহিত হয়। **হাওড়া,**

শিয়ালদহ, পাটনা, ধানবাদ, ভাগলপুর, গয়া, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, চিত্তরঞ্জন, ডালমিয়া নগর প্রভৃতি এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত।

৫। **সাউথ-ইস্টার্ণ** বা **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ** (South Eastern Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য ৬,৮৪২ কি-মি., ইহার সদর কার্যালয় **কলিকাতা**। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। **জামসেদপুর, বিশাখাপত্তনম্, পুরী, কটক, ভুবনেশ্বর, নাগপুর, রৌরকেলা, ভিলাই** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত। এই অঞ্চলের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং খনি সমূহের উন্নতি এই রেলপথের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সম্প্রতি হাওড়া-আমতা-চাঁপাডাঙ্গা রেলপথটি ব্রডগেজে পরিণত করিয়া সাঁতরাগাছির নিকটে সাউথ-ইস্টার্ণ রেলপথের সহিত যুক্ত করিবার এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে কয়লা, আকরিক লৌহ, লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য, ম্যাঙ্গানিজ, চুনাপাথর, অভ্র, চাউল, কাঠ, লাক্ষা প্রভৃতি পণ্য পরিবহন করা হয়।

৬। **সাদার্ন** বা **দক্ষিণ রেলপথ** (Southern Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য ৭,৪৫২ কি-মি., সদর দপ্তর **মাদ্রাজ**। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তর্ভুক্ত। এই রেলপথ রায়চুর, পুণা ও বিজয়ওয়াড়ায় সেণ্ট্রাল রেলপথের সহিত এবং ওয়ালটেয়ারে সাউথ ইস্টার্ণ রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। কার্পাস, তৈলবীজ, চিনি, তামাক, ম্যাঙ্গানিজ, আকরিক লৌহ, চর্ম, কফি, রবার, কাঠ, মশলা, নারিকেল, নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি ইত্যাদি এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। **বাঙ্গালোর, মহীশূর, মাদ্রাজ, কোচিন, ত্রিবান্দ্রম্** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

৭। **নর্থ-ইস্টার্ণ** বা **উত্তর-পূর্ব রেলপথ** (North Eastern Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য ৪,৯৭৭ কি-মি., সদর দপ্তর **গোরক্ষপুর**। বিহারে গঙ্গার উত্তরদিকের সমগ্র অংশে এবং উত্তর প্রদেশের উত্তর ও পূর্বাংশে এই রেলপথ বিস্তৃত। কাটিহার ও পুর্ণিয়াতে ইহা নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলপথের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই রেলপথে চিনি, ইক্ষু, সিমেণ্ট, চর্ম, তৈলবীজ, ভুট্টা, কাঠ প্রভৃতি পরিবহন করা হয়। **মোরাদাবাদ, বেরিলি, আলিগড়, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, বারাণসী, দ্বারভাঙ্গা, বারৌণী** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

(৮) **নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার** বা **উত্তর-পূর্বসীমান্ত রেলপথ** (North-East Frontier Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য ৩,৬২৮ কি-মি., সদর দপ্তর **মালিগাঁও-গৌহাটি**। আসাম, বিহারের পূর্বদিকের কিছু অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ এই রেলপথের অন্তর্গত। এই সীমান্ত রেলপথের একটি শাখা আসামে লামডিং হইতে শিলচর পর্যন্ত এবং অন্য একটি শাখা কলকলি ঘাট হইতে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। সীমান্তে বিস্তৃত এই রেলপথটি সামরিক দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। ইহার অধিকাংশ মিটার গেজ লাইন। ক্রমশ এই রেলপথ ব্রডগেজে পরিণত করা হইতেছে। এই রেলপথে চা, পাট, খনিজ তৈল, কমলালেবু, আনারস, কাঠ, ইক্ষু প্রভৃতি পণ্য পরিবাহিত হয়। **কাটিহার, শিলিগুড়ি, গৌহাটি, লামডিং, শিলচর, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড়, সদিয়া** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

(৯) **সাউথ সেন্ট্রাল** বা **দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ** (South Central Railways)—ইহার দৈর্ঘ্য, ৬,১৭৫ কি-মি., সদর দপ্তর **সেকেন্দ্রাবাদ**। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাংশ, কর্ণাটকের উত্তর পশ্চিমাংশ এবং গোয়ার রেলপথ লইয়া ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে এই নবম-রেলপথ অঞ্চলটি গঠিত হইয়াছে। এই রেলপথে জওয়ার, বাজরা, কার্পাস, ইক্ষু, তামাক, লঙ্কা প্রভৃতি পণ্য পরিবহন করা হয়। **হায়দরাবাদ, ওয়ারাঙ্গল, বেলগাঁও, রায়চুর, হুবলী** প্রভৃতি এই রেলপথে অবস্থিত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রেলপথগুলির উন্নতি সাধনের জন্য সরকার যত্নবান হইয়াছেন। রেলপথে নিয়মিত গাড়ী চলাচল ও পণ্যদ্রব্য পরিবহন বিষয়ে সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে রেলওয়ে বোর্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন, প্রত্যেকটি অঞ্চলে পরিচালক হিসাবে একজন করিয়া জেনারেল ম্যানেজার আছেন। এই ব্যবস্থা অঞ্চলসমূহের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে পরিবহন কার্য ত্বরান্বিত করিবার পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৫১-’৭৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রেলপথগুলির প্রভূত উন্নয়ন হইয়াছে; মালপত্র এবং যাত্রীপরিবহন দ্বিগুণের অধিক বর্ধিত হইয়াছে। রেল ইঞ্জিন, রেলগাড়ী এবং মালগাড়ীর সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫%, ৯৫% এবং ৮৭% বাড়িয়াছে। রেলপ্রতিষ্ঠানে ১৪ লক্ষের অধিক লোকের কর্ম সংস্থান হইয়াছে।

জলপথ

জলপথ সাধারণত দুই প্রকার—(১) আভ্যন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways) এবং (২) সমুদ্রপথ (Oceanic Waterways)।

(১) **আভ্যন্তরীণ জলপথ**—ভারত নদীমাতৃক দেশ। **সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী,** গোয়ার **মাণ্ডবী** ও **জুয়ারী** প্রভৃতি ভারতের নাব্য নদীগুলি আভ্যন্তরীণ জলপথ। এই সকল নদীপথে স্টীমার, লঞ্চ, মালবাহী নৌকা ইত্যাদির মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য পরিবাহিত হয়; এইরূপে একরাজ্যের সহিত ভিন্ন রাজ্যের পণ্য বিনিময় সম্ভব হয়। কলিকাতা হইতে আসাম পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র দিয়া ১,২৮০ কি-মি., এবং কানপুর পর্যন্ত গঙ্গা দিয়া ১,০৪০ কি-মি. জলপথে যাতায়াত করা যায়। পরিবহন ও জলসেচের সুবিধার জন্য ভারতের কোন কোন স্থানে খাল খনন করিয়া নাব্য নদীগুলির সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। যেমন, পাঞ্জাবের পশ্চিম যমুনা ও শিরহিন্দ খাল, উত্তরপ্রদেশের গঙ্গানদীর খাল, বিহারের শোণ নদের খাল, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের বাকিংহাম খাল, তুঙ্গভদ্রা ও পেন্নার নদীর সংযোগকারী কুড্ডাপা-কুর্নুল খাল, উড়িষ্যার মহানদীর খাল, পশ্চিমবঙ্গের ইডেন খাল, দামোদর খাল, বক্রেশ্বর খাল, মেদিনীপুর খাল, কেরালার পশ্চিম উপকূলের খাল ও ব্যাক-ওয়াটার্স (Back-waters)—এই সকল খালে লঞ্চ, টানানৌকা ইত্যাদি পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করে। ত্রিবেণী হইতে দুর্গাপুর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর খালটিও নৌবাহনোপযোগী হইয়াছে।

ভারতের নৌবাহনের উপযুক্ত জলপথ (Navigable Waterways) প্রায় ১৪,১৫০ কি-মি., ইহার এক-পঞ্চমাংশে স্টীমার যাতায়াত করিতে পারে। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার নিজ নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ জলপথ আছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভারত সরকার **কেন্দ্রীয় পরিবহন বোর্ড** (Central Inland Water Transport Board) নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করিয়াছেন।

(২) **সমুদ্রপথ**—ভারতে কলিকাতা, পারাদীপ, বিশাখাপত্তনম, মাদ্রাজ, কোচিন, মার্মাগাঁও, বোম্বাই, কান্দলা প্রভৃতি বন্দরের মধ্যে **উপকূল বাণিজ্য** (Costal Trade) চলে এবং **বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ,**

কান্দলা প্রভৃতি কয়েকটি বড় বন্দরের মাধ্যমে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, পশ্চিমে আরব, পারস্য, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের **বৈদেশিক বাণিজ্য** (Foreign Trade) চলে। মাদ্রাজ বন্দরের মাধ্যমে কার্পাসজাত বস্ত্র, তৈলবীজ, কফি, চীনাবাদাম, পশুচর্ম, ম্যাঙ্গানিজ, নারিকেলের শাঁস ও ছোবড়া, চুরট প্রভৃতি রপ্তানি হয়। খনিজ তৈল, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, ঔষধপত্র, মোটর গাড়ী ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য ইহার আমদানি পণ্য। জলপথে পণ্য বহনের জন্য যে জাহাজগুলি ব্যবহার করা হয় তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(ক) **লাইনার** (Liner)—এই জাতীয় জাহাজ যাত্রী ও পণ্যদ্রব্য বহন করে। এই জাহাজগুলির গতি দ্রুত। ইহারা নির্দিষ্ট সময়ে ছাড়ে এবং পৌঁছে।

(খ) **ট্র্যাম্প** (Tramp)—এই জাহাজগুলি লাইনার অপেক্ষা ছোট এবং ইহাদের গতিবেগ কম। অল্পমূল্যের ভারী জিনিসপত্র এই জাহাজগুলি বহন করে।

(গ) **সওদাগরী জাহাজ** (Merchant Ship)—এই জাতীয় জাহাজ কোন বিশিষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। শিল্পের মালিকগণ নিজ নিজ প্রয়োজনে এই জাতীয় জাহাজ তৈয়ারি করান। ইহাদের কোনটি তৈলবাহী, কোনটি ফলবাহী, কোনটি কাষ্ঠবাহী।

ভারতের উপকূল বাণিজ্যে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় জাহাজের সুনাম বৃদ্ধি পাওয়ায় জাহাজের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে **বিশাখাপত্তনমে** বিরাট জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের সংখ্যা ছিল ২৬০, তন্মধ্যে ২০৯টি বৈদেশিক এবং ৫১টি উপকূল বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। অদূর ভবিষ্যতে কোচিন, কলিকাতার গার্ডেন রীচ, বোম্বাই-এর মাজাগাঁও প্রভৃতি ডকে জাহাজ নির্মাণ হইবে। প্রতি বৎসর ২-৩টি জাহাজ বিশাখাপত্তনমে তৈয়ারি হয়। বৎসরে ৬টি জাহাজ তৈয়ারি করিবার জন্য ইহার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতা, বোম্বাই, গোয়া প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন বন্দরের ডকে জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থা আছে।